উৎসর্গপত্র।

পরমশুভাশীর্ভাজন—

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র চন্দ্র।

সহৃদয়-ধুরীণেষু—

বদান্যবর,

যিনি যাহা ভালবাসেন, তাঁহাকে তাহাই দিতে হয়। তাহাতে দাতারও আনন্দ, গ্রহীতারও আনন্দ। তাই আমার "ভক্তের জয়ের দ্বিতীয় উল্লাস" উল্লাসভরে আপনারই করে অর্পণ করিলাম। যিনি প্রতিদিন দীন ছাত্র প্রভৃতিকে নিয়মিত অন্নদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দিবার উপযুক্ত উপহার দরিদ্র আমরা কোথায় পাইব? তবে যা লইয়া আজ আমি আপনার নিকট উপস্থিত, নিশ্চয় জানি, আপনার রসোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহা অসামান্য। আশা করি, এ উপহারে আপনি আনন্দিতই হইবেন। কেন না, ভক্তচরিত্র যে আপনাদেরই আনন্দের সামগ্রী। ইতি।

সতত-শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

ভূমিকা।

—:০:—

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

"ভক্তের জয়"এর আর একটি উল্লাস বাহির হইল।

যাঁহাদের ভিতরে ও যাঁহার ভিতর হইতে এ জয়ের উল্লাস বাহির হইয়াছে, উভয়েই তাঁহারা কৃতার্থ। যাঁহার ভিতর হইতে, তাঁহার যেমন মনে হইতেছে——ধন্য আমি,—ধন্য আমি; যাঁহাদের ভিতরে, তাঁহারাও তেমনই মনে করুন——ধন্য আমরা,—ধন্য আমরা।

বস্তুত এ জয়োল্লাসে শ্রোতা বক্তা সকলেই কৃতার্থ।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

বড় শুভলক্ষণ! বসুন্ধরার দুঃখের হাহাকার কে ঘুচাইবে? কিন্তু যেখানে দুঃখ ও দুর্গতি,—অশান্তি ও অসন্তোষ, ভক্তের জয়ঘোষণায় অচিরাৎ সেখানে সুখ ও সুগতি,—শান্তি ও সন্তোষ। ভক্তের জয়ে জগতের এক অখণ্ড কল্যাণের দিন আসন্ন, ইহা স্থির।

সকল ধর্ম্মই বলিবেন, ভগবত্তুষ্টিই চরম ধর্ম্ম;—ভগবানের তুষ্টিবিধান কর, তোমার পাপতাপ,—দুঃখশোক সমস্তই ঘুচিয়া

যাইবে। কিন্তু সে তুষ্টি তাঁহার, ভক্তের জয়ঘোষণায় যেমন, আর কিছুতেই তেমন নয়।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভগবানের অনন্ত শক্তি,—ভক্তের জয়ধ্বনি করিয়া তবু তিনি আশ মিটাইতে পারেন নাই। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত নিজে তো তিনি কত-রকমে ভক্তের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু পূর্ণকামের কামনা তাহাতে পূর্ণ হয় নাই। ভক্তের ভিতরেও তাই মাঝে মাঝে তিনি ভক্তের জয়নির্ঘোষের শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান জয়োল্লাসে সেই শক্তিসঞ্চারের লক্ষণ সুব্যক্ত। ইহারই মধ্যে এই জয়োল্লাসের সঙ্গে আনন্দোল্লাসের এক তর-তর তরঙ্গ জগতে উত্থিত হইয়াছে।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়। যাঁর ভক্ত, তাঁর চেয়ে,—সেই ভগবানের চেয়েও ভক্ত বড়।

যিনি অধীন, তিনি যাঁর অধীন, তাঁর চেয়ে বড় হইতে পারেন না;—যাঁর অধীন, তিনিই বড়। ভগবান্ যে ভক্তের অধীন, এইজন্য ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। নিজের শ্রীমুখেই তো তিনি বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনঃ।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়। নিত্যপ্রকাশ,—সর্ব্বপ্রকাশ,—স্বয়ং-প্রকাশ-কে প্রকাশ করিয়া ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।

ভক্ত না হইলে ভগবান্‌কে কে প্রকাশ করিত? তিনি তো নিত্যই প্রকাশ পাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রকাশকে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন ভক্ত।

ভগবান্ অদৃশ্য,—অপ্রকাশ্য। আমাদের বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ইহারা ঘট, মঠ, পট,—পর্ব্বত, আকাশ, সমুদ্র,—নদী, কানন, প্রান্তর,—কাম, ক্রোধ, লোভ,—জন্ম, জরা, মৃত্যু,—সুখ, দুঃখ, তৃষ্ণা,—রাগ, দ্বেষ, ভয়, কত-ভাবে কত-কি দেখায়,—কত-কি প্রকাশ করে। এই প্রকাশ,—এই স্ফুরণ,—এই ভাতি হইতে কত-শত তত্ত্বান্বেষীর নিকটেও এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, চৈতন্যের আসনে,—চৈতন্যের পদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা হইলেও বস্তুত ইহারা চৈতন্য নহে,—প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রকাশ নাই। ইহাদের প্রকাশ্য এই মৃত্তিকার স্তূপ,—ওই পাষাণপিণ্ড যেমন জড়, নিজেও ইহারা তেমনই জড়। জড়ে প্রকাশ নাই,—জড় চৈতন্য নহে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে প্রকাশ,—যে চেতনা, তাহা তাহাদের নিজের নয়;—অন্যের। অতএব সেই অন্য যিনি,—অবাঙ্‌মনসগোচর যিনি, তাঁহাকে ইহারা প্রকাশ করিবে কিরূপে? প্রকাশ্য যে, সে প্রকাশককে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া? মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতে পারে না।

তবে ভগবান্‌কে প্রকাশ করে কে?—ভগবান্‌কে প্রকাশ করেন ভক্তি।

ভক্তিরেবৈনং নয়তি,—ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।

ভক্তিই ইহার কাছে লইয়া যায়,—ভক্তিই ইহাকে দেখাইয়া দেয়।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।

ভগবান্ নিত্যই অব্যক্ত,—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দিয়া কখন তিনি ব্যক্ত হইবার নহেন। তবু কিন্তু তিনি ব্যক্ত হন,—তবু কিন্তু তাঁহাকে দেখা যায়। দেখা যে যায়, সে তাঁর নিজের শক্তিতে;—ইন্দ্রিয়ের, মনের, বুদ্ধির শক্তিতে নয়।

ভগবান্ স্বপ্রকাশ। আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন, তাই ভগবান্ স্বপ্রকাশ। আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহাতে আছে, তাই আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিয়া ভগবান্ স্বপ্রকাশ। এই যে স্বপ্রকাশতা-শক্তি,—আপনিই আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি, ইহার নামান্তর শুদ্ধসত্ত্ব। ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানের সত্ত্বের মধ্যে,—প্রকৃতির সত্ত্বের মধ্যে কথঞ্চিৎ ইহার একটি ক্ষীণ উদ্দেশ,—একটি অস্ফুট-অস্পষ্ট সন্ধান হয় তো মিলিতে পারে, কিন্তু ইহার স্বরূপপরিচয় তাহার ভিতরে অসম্ভব। প্রকৃতির সত্ত্ব তো শুদ্ধ নয়,—মিশ্র—

অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্বে—

আর দুইটি গুণ,—রজ ও তম,—কিছু-না-কিছু প্রকৃতির সত্ত্বের

মধ্যে মিশিয়া আছেই। শুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু এরূপ নয়। এ সত্ত্বের সবটাই সত্ত্ব,—এ সত্ত্ব অখণ্ড সত্ত্ব,—পূর্ণ সত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব,—ভগবানের স্বরূপপ্রকাশক এই স্বচ্ছ-সুনির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের মতই প্রকৃতির সম্পর্কশূন্য,—ভগবানের মতই ইহা অপ্রাকৃত। অগোচর হইয়াও ভগবান্ যে আন্তরীণ শক্তিতে লোকলোচনের গোচর হন, শুদ্ধসত্ত্ব তাঁহার সেই নিজশক্তির,—স্বরূপশক্তির,—চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভক্তির সহিত এই শুদ্ধসত্ত্বের একাত্ম-সম্বন্ধ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষই ভক্তি,—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষই ভক্তির স্বরূপ—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা।

কিন্তু এই ভক্তি তো ভক্তেরই ভিতরে,—ভক্তি লইয়া তবে তো ভক্ত,—ভক্তি ছাড়িয়া তো ভক্ত নাই। তাই বলিয়াছি, সেই স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিয়া ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়।

ভক্ত না হইলে ভগবান্‌কে কে জানাইত,—কে জানিত? কে চিনাইত,—কে চিনিত?

ভগবান্ অসীম রহস্যের মধ্যে নিগূঢ়,—তিনি

নিহিতো গুহায়াম্।

ভক্ত না হইলে তাঁহার সে অসীম রহস্য কে উদ্ঘাটন করিয়া দিত?—ভক্ত না হইলে সে দুর্গম-দুষ্প্রতর্ক্য গুহার ভিতর হইতে

কে তাঁহাকে সকলের সমক্ষে বাহির করিয়া আনিত? জীবের জীবত্ব যেমন, অনন্তকল্যাণগুণনিধি ভগবানের ভগবত্তাও সেইরূপ অবিদ্যায় উপহিত, তাই মুক্তির অবস্থায়,—জ্ঞানের অবস্থায়, জীবত্ব ও ভগবত্ব, দুইটিই নিগুর্ণ নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের মধ্যে লীন হইয়া যায়——শাস্ত্রের এই অপসিদ্ধান্ত,—এই কল্পিত কথাকে পুষ্ট-প্রতিষ্ঠিত করিবার শতচেষ্টা সত্ত্বেও, অনুরাগের অপার শক্তিতে বস্তুর যাঁহারা যথার্থ পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে যাঁর মুক্তিতে অভাব নাই,—অদর্শন নাই; এখনও যেমন, তখনও তেমন, যিনি সদা-সুস্থিত,—সদা-জাগ্রত; মুক্তজনকেও যিনি নিজগুণে আকর্ষণ করেন,—মুক্তজনেরও যিনি সেবনীয়-বন্দনীয়; যাঁহার নাম নাই,—রূপ নাই, গুণ নাই,—ক্রিয়া নাই, পরিণতি নাই,—বিকৃতি নাই, বিলাস নাই,—বিভ্রম নাই, তবু সত্যসত্যই যাঁর কত নাম,—কত রূপ, কত গুণ,—কত ক্রিয়া, কত পরিণতি,—কত বিকৃতি, কত বিলাস,—কত বিভ্রম; এমন এক সত্য-সনাতন,—অজ্ঞান-কল্পিত নহে,—সত্য-সনাতন স্বচ্ছন্দবিহারী পরমবস্তু অতীত-অনাগত-আগত তিন কাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, এ তথ্য ভক্ত না হইলে কি কেহ ধারণা করিয়া,—বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেন?—ভক্ত ভিন্ন এ বেদগুহ্য তথ্য কি জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারিত? ভগবান্‌কে উড়াইয়া দিবার জন্য যে সকল কল্পিত মতবাদের উৎপত্তি, ভক্তের অভাবে তাহারা হয় তো চিরদিন মাথা তুলিয়া থাকিত,—ভক্ত না হইলে ভগবানের অস্তিত্বই হয় তো লুপ্ত হইয়া যাইত।

ভগবানের ভক্ত কোথায় নাই?—আমাদের এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে,—প্রকৃতির বাহিরে পর্য্যন্ত ভক্ত তাঁর কোথায় নাই? ভক্ত তাঁর সর্ব্বত্র। ভুবনে-ভুবনে ভগবানের নাম ও রূপ, গুণ ও লীলা অবিরাম গাহিয়া-গাহিয়া ভক্ত আপনার প্রিয়জনের সমুদায় রহস্য অনাবৃত করিয়া তাঁহার মহামহিমারসে সকলকে সিক্ত করিয়া বেড়ান। সে অমৃতরসসেকে তখন তোমার-আমার মত দুঃখী যাহারা, তাহাদের দুঃখচ্ছেদ তো তুচ্ছ কথা; পরন্তু দুঃখের যাঁহারা পারগত,—যাঁহারা আনন্দী, তাঁহাদেরও আনন্দের মধ্যে নিত্যনূতন কি-এক অপূর্ব্ব লহরীলীলা উথলিয়া উঠিতে থাকে।

ভগবান্ প্রপঞ্চের অতীত,—প্রকৃতির অতীত। তা হইলেও ভক্ত কিন্তু তাঁহাকে সেই প্রপঞ্চের ভিতরে,—প্রকৃতির ভিতরে লইয়া আসেন। ভক্তের আকর্ষণেই প্রকৃতির ভিতরে,—প্রপঞ্চের ভিতরে ভগবানের প্রকাশ। তিনি আসেন ভক্তের আকর্ষণে,—তিনি আসেন ভক্তবিনোদের জন্য—

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।

কিন্তু সেই সঙ্গে সেই অব্যক্তের অভিব্যক্তি দেখিয়া,—সেই অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ-লক্ষ নরনারীর তখন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

লক্ষ-লক্ষ নরনারীর সকল অসম্ভাবনা,—সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, ভক্ত না হইলে ভগবান্‌কে

জানাইত কে,—চিনাইত কে? জানিত কে,—চিনিত কে?

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

ভক্ত বড়,—ভক্ত বড়।

ভক্ত বড়,—শ্রীবৃন্দাবনে তাই সকলের মুখে কথায়-কথায়—রাধে রাধে !!

ভক্ত ভক্তির আধার। সেই ভক্তিতে ও ভাবে,—স্নেহে ও অনুরাগে,—প্রেমে ও প্রণয়ে আপ্তকামের অভাবসৃষ্টি করিয়া অনুক্ষণ কত যত্নে,—কত আদরে তিনি ভগবানের সেবা করেন। আনন্দসমুদ্র সে সেবায় দুলিয়া উঠে,—নিত্য তাহাতে অপরূপ বৈচিত্র্যের বিকাশ হইতে থাকে ;—এক বহু, অখণ্ড খণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন, অলৌকিক লৌকিক হইয়া পড়েন। এই অসাধ্যসাধনে,—এই অপরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্নের, এক ও অনেকের, অখণ্ড ও খণ্ডের, অলৌকিক ও লৌকিকের যুগপৎ সম্মিলনে ভক্তের দক্ষতা অতুলনীয়। ভগবান্ ভক্তের অধীন এইজন্য,—ভক্ত ভগবানের অপেক্ষা বড় এইজন্য।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

যিনি ভগবানের চরণাকাঙ্ক্ষী, আগে তাঁহাকে ভক্তের চরণে শরণ লইতে,—ভক্তের ভাবে বিভোর হইতে হইবে। ভাব শিখাইতে ভক্ত,—ভাব দিতেও ভক্ত।

ভূমিকা।

রাগমার্গের সহিত যাঁহারা পরিচিত, এ কথার মর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্ট।

ভক্তের জয়,—ভক্তের জয়।

আবার যেখানে ভক্ত, সেখানে ভক্তি; যেখানে ভক্তি, সেখানে ভগবান্।

জয় ভক্তের জয়,—

জয় ভক্তির জয়,—

জয় ভগবানের জয়।

৬৮নং বলরাম দের ষ্ট্রীট্,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসেবাসংরত
শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য
শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

ভক্তের জয়।

—:*:—

পূর্ব্ব-ভাষ।

এবার আর আমার বলিবার বড় বিশেষ কিছুই নাই। যাঁহাদের কৃপায় দ্বিতীয় উল্লাসের প্রকাশ, তাঁহাদের মহিমা-কীর্ত্তন এবার পূজ্যপাদ বলাইদাদাই করিয়াছেন। অমনটি তো আমি করিতে পারিতাম না। তাই মনে হইতেছে, তাঁহারও দয়া, আর যাঁহাদের জয়, তাঁহাদেরও দয়া। ভক্তচরিত্র-বর্ণনে আমার অযোগ্যতা প্রভৃতি প্রথমবারেই বলিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং তাহাও আর বলিতে হইবে না। কেবল একটা কথা বলিলেই খালাস। সেটা হইতেছে—এই দ্বিতীয় উল্লাসের একটু পরিচয়। এই উল্লাসে এগারটি ভক্তচরিত্র গ্রথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দশটি সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীতে এবং একটি (নারায়ণ দাস) বিখ্যাত মাসিক "অবসর" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শান্তোবা চরিত্রটি প্রখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক টেলিগ্রাফ পত্রের 'শান্তোবা'-শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। অপরগুলির অবলম্বন—দার্ঢাভক্তিরসামৃত। এবারকার কথা এইখানেই ফুরাইল। এখন তৃতীয় উল্লাসের প্রকাশের আশা অন্তরে পোষণ করিয়া আজিকার মত বিদায় লইলাম। ইতি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী,
শ্রীগৌরাব্দ ৪২৫।
মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,
সিমুলিয়া, কলিকাতা।

ভক্ত-চরণরেণু-লোলুপ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ভক্তের জয়।

সূচীপত্র।

মম ভক্তা হি যে পার্থ! ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

শুন পার্থ! বলি তোরে. যারা শুধু ভজে মোরে,
তারা মোর ভক্ত কভু নয়।
কিন্তু মোর ভক্তগণে, যারা অনুরাগ-মনে,
ভজে তারা ভক্ততম হয় ॥

ভক্তের জয়

গৌরচন্দ্র।

পরম পবিত্র সেতুবন্ধ রামেশ্বর ক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজা নামক ধর্ম্ম-পরায়ণ নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার রাজ্য শত যোজন বিস্তৃত। সংখ্যারহিত সৈন্য সামন্ত। কুবেরের তুল্য সম্পত্তি। শরীরে অসীম শক্তি। দেব-দ্বিজে অবিচলিত ভক্তি। তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী; নাম হৈমবতী। একটি পুত্র,—রামেশ্বর।

ধর্ম্মরাজার ধর্ম্মানুষ্ঠানই এক স্বতন্ত্র ব্যাপার। রাজ্যের চারি-দিকেই ধর্ম্মশালা। তিন ক্রোশ অন্তর সদাব্রত। অতিথি-অভ্যাগতের আনন্দ কলরবে সে সকল স্থান সর্ব্বদাই মুখরিত। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দীনদুঃখী ভিখারী-ব্রহ্মচারী যিনিই আসুন না কেন, তাঁহার কাছে আসিয়া কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতে হয় না। রাজ্য জুড়িয়াই মহারাজের জয়জয় রব।

'আমি রাজা' এ অভিমান মহারাজ মনেও স্থান দিতেন না। সদাই ভাবিতেন,—আমি কে তুচ্ছ মানব, আমি আবার অধীশ্বর কিসের? শ্রীরামেশ্বরদেবই সকলের অধীশ্বর; তাঁহার ইচ্ছাতেই চরাচর চালিত। অবনীপতি অবিচলিত চিত্তে রামেশ্বরদেবের

সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অমুক দেশে ভাল চাউল পাওয়া যায়, আনো রামেশ্বরের জন্য; অমুক দেশে উৎকৃষ্ট ঘৃত পাওয়া যায়, আনো রামেশ্বরের জন্য; অমুক দেশে উত্তম শর্করা পাওয়া যায়, আনো রামেশ্বরের জন্য; এইরূপে যেখানে যে ভাল জিনিসটি পাওয়া যায়, একবার কাণে শুনিতে পাইলেই হইল, অমনি তিনি সেখান হইতে সে সামগ্রীটী রামেশ্বরের জন্য সংগ্রহ করাইয়া আনাইতেন; তা তাহাতে যত অর্থই ব্যয় হউক, কিংবা যত ক্লেশই স্বীকার করিতে হউক। কিন্তু এত করিয়া সেবা করিয়াও তাঁহার আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইত না। কেবলই ভাবিতেন,—হায় আমি অতি অধম, অতি অভাজন; শ্রীরামেশ্বরের উপযুক্ত সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না। তিনি দিনে দশবার রামেশ্বরদেবের শ্রীমন্দিরে যাইতেন, শ্রীপ্রভুকে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, হৃদয়ের দুঃখের সুখের সকল কথাই কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইতেন। তাঁহার সেই কাকুতি-মিনতি ও স্তুতি-নতি দেখিলে-শুনিলে নাস্তিকের অন্তরেও ঈশ্বরবিশ্বাস না আসিয়া যায় না। ধর্ম্মরাজ তাঁহার অন্তর্য্যামী রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন একটী সামান্য রাজকার্য্যও সম্পাদন করিতেন না; রামেশ্বরে তাঁহার এতই প্রীতি, এতই আন্তরিক ভক্তি। যাহা কিছু করিতে হইবে, আপনি কর্ত্তা হইয়া তাহার মীমাংসা না করিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামী রামেশ্বরকেই তাহা বিনীত ভাবে জানাইতেন, আর অন্তর্য্যামী যেন 'এই কর' বলিয়া আদেশ প্রদান করিলে,

তবে তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। মহারাজ নিজের বলিবার আর কিছুই রাখেন নাই, রামেশ্বরই তাঁহার সর্ব্বস্ব।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন দুই সহস্র নানাসম্প্রদায়ী তৈর্থিক সন্ন্যাসী নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে-করিতে রামেশ্বরক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ এই 'জমাউতের' আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক অনেক আদর-অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের আদেশানুরূপ ভূরি ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সন্ন্যাসিবৃন্দও মহারাজের বিনয়-বিনম্র ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলেন।

মহারাজা চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসিগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া সম্প্রদায়োচিত তিলকাদি চিহ্নে চিহ্নিত ও বেশভূষায় বিভূষিত হইলেন এবং পূজা-পাঠাদি নিত্য কৃত্য সমাধা করিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে উচ্চৈঃস্বরে হরিহরি হরহর রামরাম নাম করিতে করিতে শ্রীরামেশ্বরদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন। তাঁহাদের সেই দুই সহস্র কণ্ঠের হর্ষোচ্চারিত নামধ্বনি যেন মেদিনীমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। তাঁহারা আত্মহারা হইয়া দেউলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেরই দেব-দর্শনের ইচ্ছা এতই প্রবল যে, একবার মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিতে পারিলে হয়। কাজেই তখন কে যে কাহাকে ঠেলিয়া চলিয়া যান, কিছুরই ঠিক নাই। এদিকে দেউলের শান্তি-

রক্ষকগণ ঠেলাঠেলিতে পাছে কেউ মারা যায় বলিয়া শান্তিরক্ষা করিতে আসিয়া অশান্তির মাত্রা আরও বাড়াইয়া ফেলিলেন। কত নদ-নদী গিরিসঙ্কট অরণ্যপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া,—অনাহার অনিদ্রা ও রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি পথক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া যাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তিনি ঐ অদূরে দেউলের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন, আর একটু যাইলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যায়; ঐ যে—উত্তোলিতহস্ত ভক্তমণ্ডলীর স্তুতিগীতি ও প্রচণ্ড তাণ্ডবের কেন্দ্রস্থলে শ্রীরামেশ্বরদেবের পুষ্পদলাদি-পূজিত পূত মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন না?—হাঁ হাঁ, চল চল, শীঘ্র চল, সত্বর যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করি, চর্ম্মচক্ষু ও মনুষ্যজন্ম সার্থক করিয়া লই,—এই-ভাবে সকলেই বিভোর হইয়া উঠিতেছেন, আর ব্যাকুলভাবে ভিতরের দিকে গমন করিতেছেন; তখন আর শান্তিরক্ষক কিংবা অন্য কাহারও কোন কথা কর্ণে প্রবেশ করে কি? তাই তাঁহারা প্রহরীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উধাও হইয়া মন্দিরের ভিতর হুড়াহুড়ি করিয়া ঢুকিতে লাগিলেন। প্রহরিগণ কি করেন, অগত্যা ভীতি প্রদর্শনের নিমিত্ত বেত্র উত্তোলন করিলেন। তাহাই বা তখন দেখে কে,—মানেই বা কে; সকলেরই যে সকল ইন্দ্রিয় নয়নময় হইয়া পরমেশ্বরের দর্শনপ্রয়াসী। এই-বার প্রহরিবৃন্দ আস্তেআস্তে দুই এক ঘা বেত্র চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও ব্যর্থ হইল। একনিষ্ঠার নিকটে যে সকলেই পরাভব স্বীকার করে। এইবার চারিদিক হইতে চটপট রবে বেত্রপ্রহার আরম্ভ হইল। তাহাতেও কিছু হইল না। মাঝে

হইতে উভয় পক্ষের হুড়াহুড়িতে এবং বেত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া একজন ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মারা পড়িয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে মন্দির-মধ্যে এক মহা হৈ হৈ রৈ রৈ রব পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে দেউলের বাহিরে আনয়ন করিলেন এবং দ্বারের সম্মুখে শয়ন করাইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। সকলেই উচ্চকণ্ঠে রাম নাম ঘোষণা করিয়া সেই রামেশ্বরেরই উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—প্রভু হে! তুমি ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু, শরণাগতের একমাত্র রক্ষক এবং অনাথ-জনের নাথ, তাই তোমার দর্শনে আসিয়াছিলাম; কিন্তু এ কি হইল ঠাকুর? আমাদের একজন জীবন হারাইল কেন? তুমি যদি ইহার বিচার না কর, ইহার সহিত আমরাও সকলে এইখানে জীবন বিসর্জ্জন দিব।

এইরূপ স্তুতি করিয়া সমস্ত সন্ন্যাসীই একাগ্রচিত্তে বসিয়া রহিলেন। সর্ব্বহৃদ্‌বিহারী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন। ভক্তের বেদনা তো তিনি সহিতে পারেন না; তাই লীলাময় তখন এক নবীন লীলা বিস্তার করিলেন। সকলে দেখিতে-দেখিতে দেউলের দরোজা বন্ধ হইয়া গেল। আর তাহার ভিতরে একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকারও প্রবেশ করিবার যো নাই। শ্রীপ্রভুর সময়োচিত সেবা-পূজা সকলই বন্ধ। সেবকগণ বড় ভীত হইলেন। আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না। সকলে এক-জোট হইয়া মহারাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চলা ফেরা করিয়া বেড়াইলেও সকলেই যেন অজ্ঞান অচৈতন্য;

সকলেরই প্রাণে কেবল হাহাকারধ্বনি—হায় কি হইল,—হায় কি সর্ব্বনাশ ঘটিল।

সেবকগণের সেই ভাব দেখিয়া মহারাজ বড় ব্যাকুল হইলেন এবং বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, যান-বাহন আনয়নের অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজেই দেউল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আহা তাঁহার নয়নে দরদর অশ্রুধারা, উত্তরীয় বস্ত্র ধূলায় লুটাইয়া যাইতেছে, কটির বসন খসিয়া পড়িতেছে, সেদিকেও দৃষ্টি নাই। উঠিপড়ি করিয়া তিনি দেউলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। চারিদিক ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সকল ব্যাপার দেখিয়া লইলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনেমনে বলিলেন.—হায়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, রামেশ্বর আমায় বাম হইয়াছেন।

নৃপবর আর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন না; সেইখানেই একখানি কুশাসন বিছাইয়া শয়ন করিলেন। শুইয়া-শুইয়া প্রাণেপ্রাণে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন,—বিশ্বেশ্বর হে! তোমার চরণে আমার কি অপরাধ হইল ঠাকুর! এ কথা হয় বলিয়া দাও, না হয় আমার প্রাণ লও; যদি না বলো তো আমার এই শয়ন শেষ শয়ন জানিও। এইরূপ বলিতে-বলিতে নৃপতি নিদ্রিতের মত নীরবে পড়িয়া রহিলেন। ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন; তিনি স্বপ্নমার্গে আসিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন,—রাজন্! তুমি আমার আদেশ শ্রবণ কর। রাজ্যের হানিলাভ পর্য্যালোচনা করাই রাজার কার্য্য, কিন্তু তুমি তো

তাহা দেখ না। এই যে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীটি আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তোমারই ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে আমারই সম্মুখে বেত্রাঘাতে মারিয়া ফেলিল, এ দোষ কাহার? এ সকল বিষয়ে যদি তোমার দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আর এমন ঘটনাটি ঘটিতে পারিত না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন তুমি এক কার্য্য কর,—আমার সম্মুখে এক তীক্ষ্ণাগ্র শূল প্রোথিত কর, আর তোমার পুত্রটিকে বসন-ভূষণে ভূষিত করিয়া সেই শূলের উপর চাপাইয়া দাও, সত্বর এই কার্য্য করিতে পার তো তোমার রাজ্যের কুশল, তোমারও কুশল, নচেৎ সমগ্র রাজ্য ছারেখারে যাইবে, তোমারও জীবন নষ্ট হইবে।

এই বলিয়া রামেশ্বরদেব অন্তর্হিত হইলেন; নৃপতিও সেই বজ্রবৎ বাক্যে ব্যথিত হইয়া ত্বরিত-গতি গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পত্নীর অগ্রে সকল কথাই বলিলেন। রাজমহিষী রামেশ্বরদেবের এই নিষ্ঠুর আদেশ শ্রবণ মাত্র মস্তকে করাঘাত করিতে-করিতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরণীতে ঢলিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা হইল। তিনি অমনি মহারাজের চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ! আমার সাতটি নয়, পাঁচটি নয়, সবে মাত্র একটি পুত্র, তাহাকে যমের হস্তে তুলিয়া দিয়া কাহাকে লইয়া থাকিব বল? ছার রাজ্যভোগ, রাজ্যভোগ আমি চাহি না, বাছা রামেশ্বরকে লইয়া বনেবনে ভ্রমণ করিতে হয়, তাহাও করিব, অনাহারে

মরিতে হয়, তাহাও মরিব, কিন্তু আমার কলিজার ধন আঁধলের নয়ন রামেশ্বর-রতনকে শূলে চাপাইতে দিতে পারিব না মহারাজ! —কিছুতেই পারিব না।

মহারাণীর বিলাপবাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজ চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কি করেন, কিছুই ঠিক নাই। স্নেহময়ী জননীর অঞ্চল হইতে অঞ্চলের ধন ছিনাইয়া লওয়া কি সহজ ব্যাপার? অথচ তাহাই হইল প্রাণারাধ্য দেবতার প্রীতিকর অনুষ্ঠান। একদিকে সংসারের স্নেহময় আকর্ষণ, অপর দিকে দেবতার আদেশ উল্লঙ্ঘন; ধর্ম্মরাজা বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এমন সময় তাঁহার ভগিনী হঠাৎ শ্বশুরালয় হইতে পুত্র-সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বড় দয়ার শরীর; তিনি রাজা-রাণীর অবস্থা দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ব্যাকুল ভাবে এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাহারাজাও তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনাই বলিলেন। বলিয়া শোকভরে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেন তখন কেমন একতর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি যেন সকলই লোপ পাইয়াছে। মুখে আর অন্য কথা নাই, কেবলই বলেন—হায়! আমার সবে মাত্র একটি পুত্র, তাহাকে মারিব কি করিয়া, মারিয়াই বা এ দেহ ধারণ করিব কি প্রকারে?

মহারাজের ভগিনী বড়ই বুদ্ধিমতী এবং ভগবানে তাঁহার অচলা ভক্তি। তিনি বুঝিলেন, এ আর কিছুই নয়, ইহা সেই

লীলাময় রামেশ্বরদেবেরই লীলা। ঠাকুর আমার ভক্তের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য এইরূপ খেলাই পাতিয়া থাকেন বটে। সন্ন্যাসীও তিনিই আনিয়াছেন, প্রহরীদের দিয়া বেত্রও তিনিই প্রহার করাইয়াছেন, দুর্ব্বল সন্ন্যাসীটিকে তিনিই মারিয়া ফেলিয়াছেন, আর সেই অছিলায় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার ভক্ত-মহারাজের সাংসারিক আসক্তি ও স্ত্রীপুত্রাদির মমতা কতটা কমিয়া আসিয়াছে, একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন। কম হউক, আর বেশীই হউক, মহারাজের তো রামেশ্বরদেবের উপর ভক্তি আছে, তখন তাঁহার আর বিনাশের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। এখন দেখা যাউক, ঠাকুরের এ খেলার দৌড় কতদূর গড়ায়। তিনি মনেমনে এইরূপ সিদ্ধান্ত আঁটিয়া মহারাজকে প্রকাশ্যে বলিলেন,—মহারাজ! অত অধৈর্য্য হইলে চলিবে না, আমার একটা কথা শুনিতে হইবে, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া চিন্তিয়াও দেখিতে হইবে। বলুন দেখি, মহারাজ! যে রামেশ্বরদেবের প্রসাদে আপনি এই বিষয়-বৈভব ভোগ করিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, আজ আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবেন? এ আজ্ঞার অভ্যন্তরে কি যে ব্যাপার বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কি সামান্য মানব আমরা বুঝিতে পারি? আর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াই বা লাভ কি আছে? পুত্র কিসের জন্য? অবশ্য বলিতে পারেন,—আত্মসুখের জন্য। দেবতার আদেশ অমান্য করিয়া সেই আত্মাকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন মহারাজ? কখনই

নয়,—কথনই নয়। তবে এ অকারণ হা-হুতাশ করিয়া ফল কি আছে? মহারাজ! আপনি থাকিলে আবার কত পুত্র হইবে; কিন্তু এই একটি পুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া সকল নষ্ট করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? পুত্রও তো চিরদিন থাকে না মহারাজ! মাতা-পিতা বর্ত্তমানেও তো অনেক পুত্র ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তবে আবার সেই নশ্বর রামেশ্বর পুত্রের মমতায় অবিনশ্বর রামেশ্বরদেবের আদেশ অবমাননা করেন কেন?

ভগিনী এইপ্রকারে মহারাজকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু অহো মহীয়ান্ মোহমহিমা, মহারাজ কিছুতেই আশ্বস্ত হইলেন না, ছলছল-নয়নে ভগিনীর দিকে চাহিয়াই রহিলেন। মুখে কথাটি নাই, যেন বোবা বনিয়া গিয়াছেন। রাজমহিষী ননদিনীর কথা শুনিয়াই মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, নচেৎ তিনি যে তাঁহাকে কি বলিতেন, বলা যায় না।

এইবার ভগিনী যেন ভক্তির প্রাবল্যে ফুলিয়া উঠিলেন, তাঁহার সমগ্র শরীর পুলকপূর্ণ হইয়া পড়িল, নয়নযুগল যেন দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; লজ্জাবস্ত্র কোথায় সরিয়া পড়িল; তিনি আলুথালুভাবে কিন্তু সমধিক উত্তেজনার সহিত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—মহারাজ! এ সংসারে পুত্রই কি এত বড়? থাক্— আপনার পুত্র শতায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাক্, তাহাকে শূলে চাপাইয়া কাজ নাই; এই নাও মহারাজ! আমার এই একমাত্র পুত্র গৌরচন্দ্রকে গ্রহণ কর, ইহাকে লইয়া শূলের উপর বসাইয়া দাও। নাও—নাও মহারাজ! দেবতার আদেশ প্রতিপালিত হউক,

রাজ্যের স্বস্তি—তোমার স্বস্তি সংসাধিত হউক। নাও—নাও মহারাজ! আমার আঁধার ঘরের মাণিকধনকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।

যেমন মাতা, পুত্রও তেমনি। বয়সে অল্প হইলে কি হয়, জননীর সুশিক্ষার গুণে তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছিল। সে মাতার প্রস্তাব শুনিবামাত্রই হর্ষপ্রফুল্ল-মুখে বলিয়া উঠিল,—

"বোইলা—এড়ে ভাগ্য মোর।	সতে করিবে রঘুবীর॥
এ মঞ্চপুরে দেহ ধরি।	জন্মিলে কে অচ্ছি ন মরি॥
কে আগে অবা পচ্ছে যাই।	নিশ্চল হোই কেহি নাহিঁ॥
মলে হেঁ যমদূতে আসি।	গলে লগান্তি কালপাশী॥
যম-পাশকু ঘেনি যিবে।	বিবিধ মাড়হিঁ মারিবে॥
নরকে পকাইবে নেই।	তহুঁ উদ্ধার হেলি মুহিঁ॥
হে মাত বেগে মোতে নিঅ।	প্রভুচ্ছামুরে শূলি দিঅ॥"

হায় আমার কি এতই ভাগ্য হইবে, শ্রীরঘুবীর আমায় আত্মসাথ করিবেন? এই মর্ত্তভূমে দেহধারণ করিয়া না মরিয়া কে-ই বা থাকিতে পারে? কেহ আগে, কেহ বা পাছে গমন করে এইমাত্র; কিন্তু নিশ্চল হইয়া কেহই নাই। মরিয়া গেলে যমদূত আসিয়া গলায় কালপাশ লাগাইয়া যমের পাশে লইয়া যাইবে, নানা নির্য্যাতন করিবে, তারপর আবার নরকের মধ্যে ফেলিয়া দিবে; কিন্তু অহো ভাগ্য, আজ আমি তাহা হইতে নিস্তার লাভ করিলাম। মা-গো! তুমি আর বিলম্ব করিও না; আমায় লইয়া চল, প্রভুর সম্মুখে শূলের উপর চাপাইয়া দিবে চল।

পুত্রের কথায় মাতার আর আনন্দ ধরে না। তিনি ধাইয়া গিয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। মহারাজও ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল বলিলেন,—বৎস! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার গর্ভধারিণী; তোমরা আমায় উদ্ধার করিলে; আমার বংশ রক্ষা করিলে। পরের জন্য আপন প্রাণ উৎসর্গ সহজ ব্যাপার নয়। ইহার সংবাদ সেই দীনবান্ধবের দরবারে নিশ্চয়ই পঁহুছিবে। বৎস রে! তুমিই আমার কুলের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র,—তুমিই আমার প্রকৃত পুত্র।

ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নরপতি তখন লীলাময় ভগবান্ রামেশ্বর-দেবের লীলা-মহিমা ভাবিতে-ভাবিতে অতিমাত্র বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মনেমনে বলেন,—প্রভু! তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ লইয়াই সংসার। এই স্বার্থে মজিয়াই জীব তোমায় ভুলিয়া আছে। এখানকার স্বার্থের নেশা না ছুটিলে তো তোমার করুণা অর্জ্জন করা যায় না। এই দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন সেই স্বার্থের হাত এড়াইতে পারিয়াছে, তখন ইহার প্রতি করুণাময় তোমার করুণা তো অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থ-ত্যাগীর বিজয়-পতাকা দেশে-দেশে উড়াইবার জন্যই বুঝি তুমি এই লীলার অবতারণা করিয়াছ প্রভু! ভাল, তাহাই হউক;—দেখি তুমি এই স্বার্থত্যাগীর আদর্শ শিশুকে কি ভাবে রক্ষা কর, কি ভাবে পুরস্কৃতই বা কর। ঠাকুর হে! আমরা তোমার খেলার পুতুল বই তো নয়; যাই,—তুমি আমাদের লইয়া যে ভাবে খেলাও, সেই ভাবেই খেলিয়া যাই। নরনাথ

এইরূপ কত কথা বলিয়া, সত্বর সেই ভগিনীপুত্রকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন।

"কর্ণযুগলে কর্ণাঞ্চল। কণ্ঠে লম্বাই রত্নমাল॥
বাহে বাহুটি সুকঙ্কণ। তহিঁ ঝটকে মণিগণ॥
হৃদে পদক, কটিমাঝে। সুরত্নমেখলা বিরাজে॥
হেম-তোড়র বেনি-পাদে। চমকি পড়ু অছি নাদে॥
নানা কুসুমে বান্ধি গভা। কেশ দিশই অতি শোভা॥
ভালে সিন্দূরচিতা শোহে। কিঅবা অরুণ-উদয়ে॥
তাম্বূল বোল তা অধরে। বিম্ব বিদ্রুম নিন্দা করে॥"

তাহার কর্ণযুগলে 'কর্ণাঞ্চল' পরাইয়া দিলেন। কণ্ঠে রত্ন-মালা ঝুলাইলেন। বাহুদ্বয়ে বাহুটি ও উত্তম কঙ্কণ পরাইলেন; তাহাতে মণিগণ ঝলমল করিতে লাগিল। হৃদয়ে পদক ও কটিতটে রত্নের মেখলা (চন্দ্রহার) পরিধান করাইলেন। উভয় চরণে স্বর্ণের 'তোড়র' পরাইয়া দিলেন। তাহার জলুষই বা কত, শ্রুতি-মধুর ঝঙ্কারই বা কত। মস্তকে নানা পুষ্পে গ্রথিত 'গভা'* পরাইলেন। তাহাতে কেশের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ললাটে সিন্দূরের টিপ পরাইয়া দেওয়ায় যেন অরুণের উদয় হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অধরে তাম্বুলরঙ্গিমা বিম্ব-বিদ্রুমের নিন্দা করিল।

---

* 'গভা'—গর্ভক। মস্তকে পরিবার মালা। "শিরোমাল্যে তু গর্ভকম্"। প্রাচীন বাংলা ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা,—"শিরে লটুপটি পাগ—চম্পকের গাভা"—লোচনের চৈতন্যমঙ্গল, বঙ্গবাসী-সংস্করণ, ১০৪ পৃষ্ঠা।

এইরূপ মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া গৌরচন্দ্র মৃদু-মধুর হাস্য করিতেকরিতে রামেশ্বরদেবের শ্রীমন্দির অভিমুখে গজগমনে যাইতে লাগিল। একে গৌরকান্তি, তাহার উপর রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্ব্বোপরি পবিত্রতার বিমল জ্যোতি; তাহার সেই সম্মিলিত দিব্য প্রভায় প্রভাকরও যেন হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন।

গৌরচন্দ্র কৃতাঞ্জলি করযুগল মস্তকের উপর রাখিয়া দিয়া বিদ্যুদ্‌গতি চলিয়াছে, মুখে অন্য কথা নাই, কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে,—

"নমস্তে রাম কৃষ্ণ হরি। মুকুন্দ মাধব মুরারি॥
অনন্ত অচ্যুত গোবিন্দ। জগতব্যাপী সদানন্দ॥"

বড় ঘরের কথা, জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় নিমেষে ছড়াইয়া পড়ে। রামেশ্বরদেবের আদেশে রাজা আপন ভাগিনেয়কে শূলে দিতেছেন, এই কথা দেখিতে-দেখিতে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রঙ্গ দেখিবার জন্য লোকতরঙ্গ অমনি গৌরচন্দ্রের পাছুপাছু ছুটিতে আরম্ভ করিল। গৌরচন্দ্রও যাইয়া শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইল। এমন সময় পরিজন-পরিবৃত হইয়া নরনাথও সেই স্থলে আগমন করিলেন। তাঁহার আদেশে তখনই শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র শূল প্রোথিত করা হইল। মুখেমুখে রামনাম উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। মহারাজও কৃতাঞ্জলিপুটে রামেশ্বরদেবকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর! তুমি অগতির গতি জানকীর পতি, তোমার চরণে প্রণিপাত। তোমারই আজ্ঞাপ্রমাণে আমি এই বালকটিকে শূলে চাপাইয়া তোমার পূজা দিতেছি; দয়া

করিয়া গ্রহণ কর। আমার বংশধর একটি মাত্র পুত্র, তাই তাহার পরিবর্ত্তে আমার ভাগিনেয়কে আনয়ন করিয়াছি, তাহার মাতার প্রেরণাতেই আনয়ন করিয়াছি; তাহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা কর প্রভু! ক্ষমা কর। এই বলিয়া নৃপতি সেই নির্ভীক হসন্মুখ বালকের হস্ত ধারণ করিয়া শূলের নিকটে লইয়া চলিলেন। চারিদিক হইতে অমনি শঙ্খ-মহুরী কাংস্য-করতাল মৃদঙ্গ-মর্দ্দল বাজিয়া উঠিল। জয়জয় হরিহরি ধ্বনিতে আকাশ-মেদিনী ভরিয়া গেল। কোমলপ্রাণা রমণীগণ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন,—আপনারা কাঁদিতেছেন কেন? ক্রন্দনের তো কোন কারণই দেখি না।

"সমস্তে চিন্ত নারায়ণ। এ সর্ব্ব তাহাঙ্ক ভিআণ॥
মো জীব উদ্ধার নিমন্তে। করুণা কলে প্রভু মোতে॥"

আপনারা সকলে সেই নারায়ণকে চিন্তা করুন। এ সমস্ত তাঁহারই খেলা। আমি অতি অধম জীব, আমার উদ্ধারের নিমিত্তই সেই দয়াল প্রভু এই করুণার বিস্তার করিয়াছেন। আপনারা কাঁদিবেন না, কাঁদিবেন না।

গৌরচন্দ্র হাসিহাসিমুখে এই কথা বলিয়া জয়রাম জয়রাম রবে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আপনি যাইয়া শূলের উপর চাপিয়া বসিল। আহা সতী যেন পতির সহগমনেই চলিয়াছে। শূল তাহার গুহ্যদেশ ভেদ করিয়া কটিতটে গিয়া ঠেকিল। তখনও তাহার রামনাম বলার বিরাম নাই। এই দুঃসহ দৃশ্য দেখিয়া

নৃপতি বড়ই বিকল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে বালকেরও বাক্য ফুরাইয়া গেল। সকলে হায়হায় করিতেকরিতে গৃহে গমন করিলেন। মহারাজও পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে আপন আবাসে চলিয়া আসিলেন।

গভীর রাত্রি। সকলে নিদ্রিত। এমন সময় সর্ব্বান্তর্য্যামী ভক্তবৎসল ভগবান সেখানে আসিলেন। স্বয়ং শ্রীহস্ত বাড়াইয়া ভক্তকে শূল হইতে নামাইলেন। স্নেহভরে তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া একটি হস্ত চিবুকে অপর হস্ত মস্তকে স্থাপন করিয়া মধুর স্বরে আহ্বান করিলেন,—গৌরচন্দ্র!—বাবা!—উঠে বোসো বাবা! উঠে বোসো; এই দেখ আমি এসেছি; আর তোর ভয় কিসের? তুই আমার মুক্তিপদের প্রকৃত অধিকারী। তোর আত্মত্যাগের প্রতিদানে আমি আমাকেই তোকে দান করিলাম। বাছনি রে! আহা তোর কোমল অঙ্গে না জানি কত ব্যথাই লাগিয়াছে। আর ব্যথা নাই বাছা, তুই যে ব্যথাহারী আমার কোলে। এখন যা, এই রাজ্যের রাজা হ, কিছুদিন রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ কর্; অন্তে আমার কাছেই আসবি।

ভগবানের পদ্মহস্তস্পর্শে গৌরচন্দ্রের মৃত শরীরে প্রাণ ফিরিয়া আসিল,—যাতনার নিবৃত্তি হইল। সে যেন সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, কোন্ রাজ্যের কোন্ মোহন সঙ্গীত শুনিতে-শুনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া চাহিয়া দেখে—অহো! এ যে সেই ধনুর্ব্বাণপাণি রঘুবংশশিরোমণি ভগবান্

শ্রীরামচন্দ্র! দেখিয়াই গৌরচন্দ্র প্রেমপুলকিত হইলেন এবং বারংবার প্রণাম করিয়া কম্পিত জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ভক্তবৎসল! তোমার বলিহারি যাই। হায়, কোথায় মুনীন্দ্র যোগীন্দ্রগণের দুর্লভদর্শন জানকীরঞ্জন তুমি, আর কোথায় মহাপাতকী নারকী মানব আমি। এত দয়া না থাকিলে কি আর তোমায় কেহ দয়াময় বলিয়া ডাকিত, না তোমার শরণাগতই হইত? জয় জয় প্রভু! তোমার ভক্তবাৎসল্যের জয়।

ভগবান্ ভক্তের স্তুতিবাণীতে সমধিক প্রীতিলাভ করিলেন এবং স্বহস্তে তাহার মস্তকে 'পাটশাড়ী' বান্ধিয়াদিয়া বলিলেন,—যাও, আজ হইতে তুমিই এই রাজ্যের নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইলে। আমাতে যখন তোমার চিত্ত অর্পিত রহিয়াছে, তখন আর ভয় পাইবার কিছুই নাই। যাও, পরম সুখে কালাতিপাত কর।

না না—তুচ্ছ রাজত্ব চাহি না, তোমায় ছাড়িয়া বিষয়-রসে মজিয়া থাকিতে চাহি না; গৌরচন্দ্র এই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে না বলিতে ভগবান্ হাসিতে-হাসিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। ভগবানের হাসি তো সহজ হাসি নয়, সে যে—"হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া।" সেই সর্ব্বজনমোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ আনন্দ-জড় গৌরচন্দ্র 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে তখন কোটিকন্দর্পের প্রভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার আলোকে সেই স্থানটাই আলোকময় হইয়া উঠিল। এদিকে ভগবান্ আপনার শ্রীমন্দিরের দ্বারে

আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি আসিবামাত্রই দেউলের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। তারপর সেই মৃত সন্ন্যাসীটির প্রতি তিনি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। সন্ন্যাসীও অমনি চৈতন্য পাইয়া জয় রাম জয় রাম বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিয়া সন্ন্যাসিবৃন্দ পরমানন্দিত হইলেন। তাঁহারা হরিহরি জয়জয় রবে পৃথিবী পরিপূরিত করিয়া ফেলিলেন এবং ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে শতশত সাধুবাদ দিয়া যে যথায় ইচ্ছা চলিয়া গেলেন।

এদিকে নৃপবর গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, একা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেই মহা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই বলেন,—ও মহারাজ! আপনি যে একাই ফিরিয়া আসিলেন, আমাদের প্রাণের গৌরচন্দ্রকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন? হায়, তাহাকে না দেখিয়া আমাদের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বলুন,—বলুন মহারাজ! গৌরচন্দ্রের কুশল ত?

মহারাজ আর কি বলিবেন। শোকভরে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে কাহারও আর বাকি রহিল না। শোকের আতিশয্যে সে দিবস কেহ আর অন্ন ভোজন করিলেন না; সকলেই অনশনে শয়ন করিয়া রহিলেন। কত-কি চিন্তা করিতে-করিতে মহারাজের যেন একটু তন্দ্রাবেশ আসিল; ভগবান্‌ও অমনি তথায় আসিয়া স্বপ্নমার্গে তাঁহাকে আজ্ঞা করিতে লাগিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আমার আদেশ শ্রবণ কর; গৌরচন্দ্রের জন্য ভাবিও না, সে জীবিত

আছে; তুমি সত্বর যাইয়া তাহাকে লইয়া আইস,—এই রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত কর। আজ হইতে তোমার বংশের কেহ আর রাজা হইতে পারিবে না, হইতে গেলে তাহার জীবন তখনই বিনষ্ট হইবে। তুমি যাও, শীঘ্র গৌরচন্দ্রকে মহা সমারোহে আনয়ন করিয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়া দাও। তুমি যাইলেই দেখিতে পাইবে এখন, আমি তাহার মস্তকে রাজপদের 'পাটশাড়ী' বাঁধিয়া দিয়াছি।

এইরূপ আজ্ঞা দিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, মহারাজও আস্তেব্যস্তে উঠিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—কেহই কোথাও নাই। তাঁহার বড় বিস্ময় জন্মিল,—তাই ত, গৌরচন্দ্রকে তো শূলে চাপাইয়া আসিলাম, সে তো মৃত্যুপুরে চলিয়া গেল, আবার তাহার আগমন কি প্রকারে সম্ভবে? ভাল, যাই না হয় একবার দেখিয়াই আসি—দয়াময় প্রভু আমার যদি জীবন-দান দিয়াই থাকেন। যাইয়া যদি তাহাকে জীবিত দেখিতে পাই, আমি তাহার ভৃত্য হইয়া থাকিব। এই বলিয়া নৃপতি চঞ্চল-চরণে শূল-স্থানে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—অপূর্ব্ব ব্যাপার! গৌরচন্দ্রের দিব্য আলোকে সেই স্থানটা আলোকময় হইয়া গিয়াছে। আকাশের কলঙ্কিচন্দ্র আজ এ চন্দ্রের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। আহা আহা কি বিমল স্নিগ্ধ আলোক গা! নৃপতি আরও দেখিলেন,—তাহার মস্তকে পাটশাড়ী বাঁধা। আর সে পদ্মাসনে বসিয়া রাম-কৃষ্ণ-বনমালী প্রভৃতি ভগবানের নামাবলী মধুর-মধুর কীর্ত্তন করিতেছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান

বিলুপ্ত ; আহা সে বুঝি আর ইহলোকে নাই! দেখিয়া নৃপতির সকল শরীর পুলকপূর্ণ হইল। তিনি যেন আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—গৌরচন্দ্র রে! তুই ধন্য। তোকে যখন আমি দেখিয়াছি, তখন আমাকেও ধন্য বলিতে হইবে। হায় প্রভু! তোমার মহিমাও ধন্য। তুমি তোমার ভক্তের গৌরব রক্ষা করিলে। এ কার্য্য কি এ জগতে আর কেহ করিতে পারে প্রভু? এই মৃত শরীরে জীবনীশক্তির সঞ্চার কি সহজ কথা? এ কার্য্য এক তুমিই করিতে পার, আর করিয়াছও তুমিই। তোমার ভক্ত-প্রীতির বলিহারি যাই—প্রভু বলিহারি যাই।

মহারাজ ভক্তিভরে এইরূপ কত কথা কহিতে-কহিতে নিকটে গিয়া গৌরচন্দ্রের কর-ধারণ করিলেন। আহা আহা এ আবার কিসের—কোন্ হিমকিল-চন্দনের, -না উশীরলেপনের,—না পঙ্কজ-মৃণালের,—না তুষারোপলের, এ কিসের সুখদ শীতল স্পর্শ গো? এ যে সকল শরীর মন প্রাণ জুড়াইয়া দিল গো, জুড়াইয়া দিল। নৃপতি সাক্ষাৎ ভগবৎস্পৃষ্ট সেই গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-সংস্পর্শে যেন কিছুক্ষণ অবশ অচেষ্ট হইয়া রহিলেন। তিনি তখন এ রাজ্যে কি আর কোথাও, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। সংজ্ঞা হইবা মাত্র তিনি গৌরচন্দ্রকে বাহুযুগলে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করিয়া আদরভরে ডাকিলেন—গৌরচন্দ্র!—বাবা গৌরচন্দ্র! চল, চল বাবা গৃহে যাই, তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আমরা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হই।

গৌরচন্দ্র,—কিসের গৌরচন্দ্র? গৌরচন্দ্র কি তখন আর এ জগতের কোন সমাচার রাখিতেছে? তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় যে তখন হৃষীকেশের নামামৃত-পানে বিভোর। সে মুহুর্ম্মুহু সেই নামাবলীই বলিতে লাগিল। নৃপতির কিন্তু আর ত্বরা সহিল না। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়াই আপন ভবনে আনয়ন করিলেন। মন্ত্রি-মিত্র প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া আনাইয়া তখনই তাহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। পরে প্রজাবর্গকে আহ্বান করাইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে যথাবিধি রাজদণ্ড ও রাজচ্ছত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—সকলে শ্রবণ কর, আজি হইতে গৌরচন্দ্রই তোমাদিগের রাজা হইলেন এবং আমি ইঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী হইলাম।

ধর্ম্মরাজার তখন আনন্দ দেখে কে? তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন,—কে কোথায় আছ, বাজাও বাজাও বাজানা বাজাও। গায়কগণ! গান কর, নর্ত্তকীগণ! নৃত্য কর, বন্দিগণ! নবীন মহারাজের স্তুতিগীতি আরম্ভ কর,—জয়জয় নাদে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ কর।

তাহাই হইল; মহারাজের আদেশ প্রচার হইতে না হইতে তূরী-ভেরী শানাই-মহুরী মৃদঙ্গ-মর্দ্দলাদি বিবিধ বাদ্য মেঘমন্দ্রে বাজিয়া উঠিল। গৃহেগৃহে মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল। নর্ত্তকীগণের নৃত্যে ভট্ট-মাগধ-বন্দিগণের স্তুতিগীতিতে এবং গায়ক-গণের গানে সকল দেশ উৎসবময় হইয়া উঠিল। নবীন মহারাজ গৌরচন্দ্রের,—আত্মত্যাগীর আদর্শ গৌরচন্দ্রের,—ভগবানের একান্ত ভক্ত গৌরচন্দ্রের জয়জয় রবে ধরাধাম পূর্ণ ও ধন্য হইয়া গেল।

জগদ্বন্ধু মহাপাত্র।

চারিশত বৎসরের কথা, উৎকলদেশাধিপতি মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রদেবের আমলে শ্রীজগদ্বন্ধু মহাপাত্র নামে শ্রীজগবন্ধুর জনৈক সেবক পণ্ডা ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সেবকগণের মধ্যে ইঁহারা অতিশয় খ্যাত,—তিলিচ্ছ মহাপাত্রের ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশেষত জগদ্বন্ধু মহাপাত্র বিদ্যা-বুদ্ধি শৌচ-সদাচার ও সাধন-ভজনের গুণে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র এবং বিনয়-বিনম্র ছিলেন। তাঁহার সহগুণ অসাধারণ, দেখিলে বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। দীন-দুঃখীকে অত আদর করিয়া আহার করাইতে বুঝি আর কেহ পারিত না। মুখের কথাই বা কি মধুমাখা; শুনিলে কাণ প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

সেবক প্রভুর সেবা করে, সাধারণত দেখা যায়—সে কেবল শরীর কিংবা বাক্য দ্বারাই প্রভুর সেবা করে, কিন্তু মনেমনে আপন স্ত্রীপুত্রাদির সেবাই করিয়া থাকে। জগদ্বন্ধু মহাপাত্র শ্রীজগবন্ধুর এ প্রকার সেবক ছিলেন না; তিনি কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবক ছিলেন। তিনি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এই তিনের সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না। শ্রীপ্রভুদের শয্যোত্থান হইতে পুনরায় শয়ন পর্য্যন্ত যতকিছু সেবা, নিত্যই তিনি স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি প্রভুদের বসন-ভূষণ পরাইতেন, শ্রীঅঙ্গে গন্ধ-চন্দন-কস্তুরী লেপন করিতেন, তিলক রচনা করিয়া

দিতেন, ধূপ-আরতি করিতেন, কর্পূর-দীপ জ্বালিয়া দিতেন, তুলসী কিংবা পুষ্পের ধণ্ডামালা (বড়মালা) পরাইতেন, শ্রীমুখের 'সিংহার' (বেশরচনা) করিতেন। তিনি নিশিদিসি এই সেবা লইয়াই উন্মত্ত থাকিতেন। দারুহরিই তাঁহার গুরু ইষ্টদেবতা, দারুহরিই তাঁহার ধন-সম্পদ, দারুহরিই তাঁহার আত্মীয়-বান্ধব। তিনি তাঁহারই পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহারই নাম ভজন করিতেকরিতে পরমানন্দে দিন যাপন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন মহারাজ প্রতাপরুদ্র অনেক সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীপ্রভুর দর্শনার্থ আগমন করিলেন। সে ধূম-ধাড়াক্কা দেখে কে? আগে-আগে শতশত শঙ্খ বাজিতেছে, পাছেপাছে বীরতূরী সানাই-মহুরী মৃদঙ্গ-মর্দ্দলাদি তুমুল নিনাদিত হইতেছে। আশা-শোঁটা ত্রাস-ছত্র প্রভৃতি রেসেলার তো সীমা-পরিসীমাই নাই। তারপর ভারেভারে শ্রীজীউর সেবার উপহার চলিয়াছে। "এই মহারাজ বিজয় করিতেছেন, এই মহারাজ বিজয় করিতেছেন" এই কথা মুখেমুখে কথিত হইতেহইতেই মহারাজ একেবারে সিংহদ্বারে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র সেবকবৃন্দ একসঙ্গে ধাইয়া গিয়া মহাপাত্রকে বলিলেন,—মহাপাত্র! মহাপাত্র! মহারাজ বিজয় করিতেছেন—বিজয় করিতেছেন। ঐ দেখুন, তিনি দেউলের মধ্যেই আসিয়া পঁহুছিয়া গিয়াছেন।

বলিতেবলিতে মহারাজও প্রায় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত। অকস্মাৎ মহারাজকে আসিতে দেখিয়া মহাপাত্র চমকিয়া উঠিলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি প্রভুর সম্মুখে গমন করিয়া রত্নবেদীতে আরোহণ করিলেন। ব্যগ্রভাবে প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার কিরীটে কুসুম নাই। কি সর্ব্বনাশ! এখন আমি রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কি দিয়া? শ্রীপ্রভুর মৌলিস্থিত পুষ্পই যে 'রাজ-প্রসাদ'—মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার সামগ্রী। মহারাজও তো আসিয়া পড়িলেন দেখিতেছি। ফুল আনিয়া পরাইবার সময় নাই। হায় হায়! এইবার আমার সকল মহত্ত্বই সরিয়া গেল। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া মহাপাত্র অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অন্য উপায় নাই দেখিয়া আপনার মস্তক হইতে প্রভুরই প্রসাদী নির্ম্মাল্য লইয়া তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। নৃপবরও অমনি সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যথাবিধি শ্রীপ্রভুর দর্শনাদি সমাপনপূর্ব্বক প্রসাদ-পুষ্পের প্রত্যাশায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। মহাপাত্র যথারীতি জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া শ্রীজগবন্ধুর মস্তক হইতে সেই পুষ্প লইয়া মহারাজের করে অর্পণ করিলেন। মহারাজও ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার নগরে ফিরিয়া আসিতে দিবস শেষ হইয়া গেল। তিনি দিব্য সিংহাসনে বসিয়া বসিয়া সেই প্রসাদী নির্ম্মাল্য লইয়া একবার মাথায় রাখিতেছেন, একবার চক্ষে ধরিতেছেন, একবার আঘ্রাণ করিতে-ছেন, অমনি প্রীতিভরে চক্ষু দুইটি যেন বুজিয়া-বুজিয়া আসিতেছে, প্রাণে বিমল আনন্দের উৎস উঠিতেছে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে-করিতে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল,—সেই নির্ম্মাল্যের মধ্যে কএক

গাছি কালো কালো চুল রহিয়াছে। সাদায় তো কালো লুকাই-বার যো নাই। সে সাদা ধপধপে জাতীফুলের গভা (শিরোমাল্য); কাজেকাজেই চুল ক'গাছা আর অধিকক্ষণ ছাপা থাকিল না; ধরা পড়িয়া গেল। মহারাজ ভাবেন,—এ কি বিপরীত ব্যাপার, মহাপ্রভু জগন্নাথের মাথার পুষ্প, ইহাতে চুল আসিল কি প্রকারে? নিশ্চয়ই এ মহাপাত্রেরই মাথার পরা পুষ্প প্রসাদ বলিয়া আমার করে অর্পিত হই-য়াছে। ভাল, এ বিষয়ে একটা তদন্ত করিয়া দেখিতে হই-তেছে। এই বলিয়া নরনাথ কয়েকজন লোককে পুরী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন; বলিয়া দিলেন,—যাও, তোমরা সত্বর তিলিচ্ছ মহাপাত্রের নিকটে যাও, যতশীঘ্র পার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস; খবরদার দেখো—বিলম্ব কর তো সবংশে বিনাশ করিব।

নৃপতির আজ্ঞা শ্রবণে তাহারা ক্ষিপ্রগতি দেউলে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং মহাপাত্রকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের অগ্রে হাজির করিয়া দিল। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ কালভুজঙ্গের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—মহাপাত্র! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি—প্রভুর মস্তকে চুল উঠিল কত দিন? যদি জীবনের সাধ থাকে, শীঘ্র ইহার উত্তর দিতে চাও; নচেৎ নিশ্চয়ই মৃত্যুপুরে যাইতে হইবে, জানিও। এই দেখিতেছ কি,—আমার হস্তের দিকে চাহিয়া দেখ, এই প্রসাদী পুষ্প দেখিতেছ কি, ইহাতে চুল আসিল কোথা হইতে? বল,—তৎপর ইহার উত্তর বল।

নৃপতির উক্তি শুনিয়া মহাপাত্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। এত দুর যে গড়াইবে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অবশ্য ইহা প্রভুরই খেলা; ভাবিয়া তিনি মনেমনে তাঁহারই শরণাগত হইলেন,—মনেমনেই বলিলেন,—প্রভু হে! আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর। মহাপ্রতাপী প্রতাপরুদ্র নরপতি, তাঁহার হস্তে আজ আর আমার নিস্তার নাই। তুমি না রাখিলে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে দেখিতেছি। ঠাকুর! মরি তাহে ক্ষতি নাই, ক্ষোভও নাই; কিন্তু তোমার সেবক আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মরিব, বড়ই লজ্জার কথা—মর্ম্মপীড়ার কথা। তাই বলি প্রভু! তুমি একটু করুণা-নয়নে চাহিয়া দেখিও, আমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখন মিছা-কথায় রাজাকে বঞ্চনা করি; তারপর তুমি যাহা করিবে তাহাই হউক; কিন্তু দেখো নাথ! তোমার সেবকের যেন কলঙ্ক না হয়,—রাজদণ্ড যেন তাহাকে ভুগিতে না হয়। মহাপাত্র মনেমনে মনের অধীশকে এইরূপ বলিয়া কহিয়া প্রফুল্লবদনে প্রকাশ্যে প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,—মহারাজ! প্রভুর মস্তকে যে কেশ উঠিয়াছে, তাহা কি আপনি জানিতেন না?

ইহা শুনিয়া নৃপতি বলিলেন,—ভালই; তুমি আমাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে কি? উত্তরে মহাপাত্র বলিলেন,—নিশ্চয়ই,—আপনি শ্রীজীউর দেউলে বিজয় করুন; আমি নিশ্চয়ই দেখাইয়া দিব। যদি না পারি, যে দণ্ড দিবেন, অবনত-মস্তকে স্বীকার করিব। মহারাজ বলিলেন,—উত্তম; কল্যই তোমার কথার বুঝাপড়া হইবে। আজ এখন যাও। কাল যদি প্রভুর

মস্তকে কেশ দেখাইতে পার, তোমারই মঙ্গল; না পার তো এ রাজ্য তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে, জানিও। তোমাকে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; তুমি তো আমাকে উত্তমরূপে চেনো। এই বলিয়া নরনাথ তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মহাপাত্র তথা হইতে আর গৃহে গমন করিলেন না। বরাবর শ্রীপ্রভুর সম্মুখেই আসিলেন। প্রভুর ভোগ আরতি বড়সিংহার পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি নিত্যকৃত্য সমাধা হইয়া গেল। তিনি তখন সেই সেবকবৎসলের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন, তার পর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিয়া কপালে করসম্পুট রাখিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ওহে মহাবাহু! আমি আর তোমার সম্মুখে অধিক কি জানাইব। অন্তর্যামী তুমি সকলই তো জানিতেছ। ইতর লোককে উচ্চ পদ দিলে এইরূপই হইয়া থাকে প্রভু! ফলে হয় কি, কালে প্রভুর মহত্ত্বই খর্ব্ব হইয়া যায়। কুক্কুরকে প্রশ্রয় দিলে, সে তো বুকে পা দিয়া উঠিয়া মুখ চুম্বন করিবেই। সর্পকে অমৃত পান করাইলে সে তো বিষ বমন করিবেই। আমারও দশা ঠিক তেমনই হইয়াছে। হায়, যে তোমার পাদ-পদ্ম ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ আনত-মস্তকে অহরহ বন্দনা করেন, কমলা দেবী নিরন্তর যে চরণ-কমলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, যে চরণ-নিঃসৃতা সুরধুনী তিন লোক পবিত্র করিতেছেন এবং যে চরণ-বারি শিরে ধারণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, যে চরণ-পদ্ম ধ্যান করিয়া যোগিগণ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, শুক-সনকাদিও যে

পদারবিন্দ সেবার যোগ্য কি না সন্দেহ, তুমি কি না, নগণ্য কীটাণুকীট মহাপাতকী মানব আমি, যে তোমার সম্মুখে যাইবারও যোগ্য নয়, সেই আমাকে তাহার সেবার অধিকার অর্পণ করিলে? ফলও উপযুক্ত হইয়াছে। আমি ও-পদের মর্য্যাদা রাখিব কি প্রকারে? তোমার সেবক-পদ পাইয়া আমি মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া পড়িলাম, লঘু গুরু জ্ঞান হারাইলাম, তোমার মহত্ত্ব বিস্মৃত হইলাম, অন্যে পরে কা কথা—তোমারই অবমাননা করিয়া বসিলাম,—আমার মাথায় পরা ফুল লইয়া তোমার মাথায় পরাইয়া দিলাম। হায় প্রভু! আমি আবার তোমার সম্মুখে মুখ ফুটিয়া এই কথা বলিতেছি? তুমি ঐ হস্তস্থিত চক্র দিয়া আমার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেল প্রভু! এখনই আমার পাপ জীবনের অবসান হইয়া যাউক। ঠাকুর হে! তোমায় স্পষ্টই বলিতেছি, আমি তোমার কাছে জীবনের ভিখারী নহি; তুমি যদি জীবন সংহার না কর, আমি এ জীবন রাখিবও না, বিষ-ভক্ষণে ত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। তুমি কেবল এইটুকু করুণা করিও; যেন রাজদণ্ড ভোগ করিতে না হয়। সর্ব্বান্তর্যামিন্! আমি রাজার নিকটে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা ত জানিতেই পারিয়াছ। এখন তুমি যদি দয়া করিয়া ইহার কোন বিধিব্যবস্থা না কর, তবে কল্য রজনী-প্রভাতেই রাজা আমাকে ধরাইয়া লইয়া গিয়া কঠোর দণ্ড বিধান করিবেন; তাহা কি আমি সহিতে পারিব,—না, সহিবার অপেক্ষা করিব? দয়াময়! তুমি ভৃত্যপ্রিয়,—লাঞ্ছিত তিরস্কৃত অবমানিত হইয়াও

তুমি ভৃত্যের মান বাড়াইয়া থাক। ঐ যে ভৃগুপদচিহ্ন তোমার বক্ষে জলজল জলিতেছে, ও তো তাহারই নিদর্শন? সেই সাহসেই নাথ! নৃপতির নিকট মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা। কিন্তু এ কথা সত্য জানিও যে, অদ্য রাত্রি মধ্যে কৃপা না করিলে নিশ্চয় বিষ-ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব।

মহাপাত্র শ্রীজগন্নাথকে এইরূপ নিবেদন করিয়া তাঁহার চরণতলে সটান্ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, তারপর উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। শ্রীজগন্নাথেরও দেউলের দ্বার রুদ্ধ হইল। 'বেঢ়া-নিশোধ' করিয়া (মন্দিরের চারিদিক্ জন-মানব-শূন্য করিয়া) সেবকগণ চলিয়া গেলেন। মহাপাত্রও অত্যন্ত সন্তাপিত চিত্তে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কিছু বিষ সংগ্রহ করিয়া কাছে রাখিলেন। কিছুই আহার করিলেন না। প্রভুর পাদপদ্মে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। দু'নয়নে দর-দর অশ্রুধারা। সঙ্কল্প স্থিরই আছে,—প্রভু দয়া না করিলে রাত্রিপ্রভাতের পূর্ব্বেই বিষভোজনে জীবন বিসর্জ্জন করিব।

চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতে-করিতে মহাপাত্র নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ তাহা জানিতে পারিলেন। তিনিও অমনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে আসিয়া স্বপ্নযোগে আজ্ঞা করিলেন,—মহাপাত্র! তুমি আমার প্রিয়তম ভক্ত; তোমার অত চিন্তা কিসের? যে আমার মত প্রভুর সেবা করে সে আবার ছার অপর কাহার ভয় করিবে? আমি নীলাচলে

বসিয়া থাকিতে-থাকিতে একা নৃপতির কথা কি, কোটিকোটি জগতীপতি আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। আর তুমি যে মিথ্যা-কথার জন্য এত ভীত হইযাছ; তাহা তো মূলেই মিথ্যা নয়। কেন, আমি কি নেড়া,---আমার মস্তকে কি কেশ নাই? এই দেখনা, কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপে আমার মস্তক ভরিয়া রহিয়াছে। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি একটু রাত্রি থাকিতেথাকিতে আমার কাছে আসিও; প্রত্যক্ষ আমার কেশ দেখিতে পাইবে, আর রাজাকে দেখাইয়াও তাহার মনের সন্দেহ মিটাইয়া দিতে পারিবে। এই বলিয়া ভক্তবৎসল চলিয়া গেলেন। দেউলে গিয়া স্বর্ণপর্য্যঙ্কে কমলাদেবীর অঙ্কে শয়ন করিলেন। ভৃত্যকে আশ্বস্ত করিয়া তবে যেন তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল। ভালবাসার ঠাকুর ভালবাসার আভাষ পাইলেও এতটা ভালই বাসেন বটে!

এদিকে মহাপাত্র নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখেন, আশে-পাশে কেহই নাই। প্রাণে বিমল আনন্দ। মনেমনে ভাবেন,—নিশ্চয়ই প্রভু দয়া করিয়াছেন। না, আর শয়ন করিব না। স্নানাদি সারিয়া সত্বর শ্রীমন্দিরে গমন করি। আমার দয়াময় প্রভুর দয়ার বিকাশ দর্শন করিগে। এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিলেন, নিত্যকৃত্য-স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক ত্বরিতপদে দেউলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তখনও রাত্রি এক প্রহর অবশিষ্ট রহিয়াছে। হইলে কি হয়, তিলিচ্ছ মহাপাত্রের আদেশ অন্যান্য সেবকগণ সম্মানের সহিত পালন করিয়া থাকেন। তাই

অসময়ে শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মোচন করাইতে বেগ পাইতে হইল না। তিনি দ্রুত-গতি দেউলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একবারে যাইয়া রত্নবেদীর উপরে উঠিলেন। প্রাণে সংশয় আছে কি না, তাই প্রভুর অন্য অঙ্গের দিকে না দেখিয়া আগে মস্তকের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া আনন্দ আর ধরে না। কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূরিয়া গেল। অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল। পুলকে শরীর পূর্ণ হইয়া গেল। গদগদে বাণী রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন কি? দেখিলেন,—শ্রীপ্রভুর মস্তক ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশে ভরিয়া গিয়াছে। সেই কেশে আবার নানা ফুলের শোভন বেশ, পৃষ্ঠদেশ দিয়া সেই কেশগুচ্ছ রত্নবেদী স্পর্শ করিয়াছে। আহা আহা, যেন নবীন জলধরের উপর নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশখানি খসিয়া পড়িয়াছে!

এইবার মহাপাত্রের মনের বল-ভরসা বাড়িয়া গেল, তিনি সংশয়-রহিত-চিত্তে শ্রীজগন্নাথের সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এদিকে মহাপ্রতাপশালী প্রতাপরুদ্র প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই শ্রীমন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি যতদূর সম্ভব সত্বর আসিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাপাত্র সেইখানেই ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজ বলিয়া উঠিলেন,—কই, কই বিপ্র! তোমার জগন্নাথের মস্তকে কেশ কই? মহাপাত্রও হাস্যমুখে বলিলেন,—মহারাজ! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? প্রভু তো ঐ আপনার সম্মুখেই রহিয়াছেন; আপন ইচ্ছামত দর্শন করিতে পারেন। মহারাজও "বেশ বেশ"

বলিয়া শ্রীরত্নবেদীসমীপে গমন পূর্ব্বক প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখেন,—অহো, কি সুন্দর কি সুন্দর! প্রভুর মস্তক কৃষ্ণকেশে ভরিয়া রহিয়াছে,—পৃষ্ঠদেশেও গুচ্ছগুলি লম্বমান হইয়া নিতম্ব স্পর্শ করিয়াছে।

মহারাজ দেখিলেন বটে, কিন্তু মনে বেশ বিশ্বাস জন্মিল না,—চুলগুলি অকৃত্রিম কি না। তিনি আবার বিপ্রবরকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাপাত্র! সত্য করিয়া বল, প্রভুর এই কেশ-গুলি কৃত্রিম কি না? বলি, মোম-টোম গালা-টালা দিয়া তো পরের কেশ প্রভুর মাথায় লাগাইয়া দাও নাই? এ যে বড় বিচিত্র কথা, সহজে বিশ্বাস করা যায় কি?

মহাপাত্র বলিলেন,—মহারাজ! যদি অবিশ্বাসই হয়, নিজেই তো পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। মহারাজও শশব্যস্তে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রভুর মস্তকের গোটাচারি কেশ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিলেন। আর বলিতে জিহ্বায় জড়তা আইসে, অমনি প্রভুর মস্তক হইতে ফিণিক দিয়া রুধিরধারা বাহির হইয়া পড়িল। দেখিয়া নৃপতি তো আর নাই; তিনি ঢলিয়া ধরণী-তলে পড়িয়া গেলেন। সেবকগণ জলসেকাদির দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্তি-মাত্র মহারাজ মহা-পাত্রের যুগলচরণে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-করযুগল মস্তকে রাখিয়া কাঁদিতেকাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—দ্বিজবর! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি মহা মূর্খ মহা অপরাধী। হায়, এইবার আমি সবংশে বিনষ্ট হইলাম। প্রভুর যে সেবকের প্রতি এত দয়া,

তাহা এতদিন জানিতাম না, কিন্তু আজ ভালই জানা গেল যে, ভগবান্ ও ভক্ত ভিন্ন নহেন; তাঁহাদের মরমে-মরমে মাখামাখি; ভক্তের মান-অভিমান দুঃখ-সুখ সম্পদ-বিপদ্ যাহা কিছু, ভগবানের অন্তরে-অন্তরে অনুভূত হইয়া থাকে। হায় হায়, মূঢ় আমি কি মন্দ কর্ম্মই করিলাম? আমি ভগবানের কাছে অপরাধী, ভগবানের ভক্তের কাছেও অপরাধী হইলাম। হায় হায়, আমি জ্বলন্ত অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিলাম। সাধ করিয়া কালকূট বিষ খাইয়া ফেলিলাম। আর তো উদ্ধারের উপায় নাই উপায় নাই,—এখন ভক্তবর! তুমি যদি দয়া করিয়া আমায় রক্ষা কর, তবেই।

এইরূপ বলিতে-বলিতে মহারাজের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তাঁহার মস্তকের মুকুট কোথায় চলিয়া গেল। তিনি ব্রাহ্মণের চরণে মস্তক লুটাপুটি করিতে-করিতে চেষ্টাহীন হইয়া পড়িয়া রহিলেন। মহাপাত্রও মহারাজকে কোলে করিয়া তুলিয়া-ধরিয়া স্নেহ-সম্ভাষণে কহিলেন,—দণ্ডধর! তোমার কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক। দোষ তোমার নয়, আমারই হইয়াছিল। তবে কি জানি করুণাবারিধি দারুহরির কি মহিমা; তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপন কৃপাবৈভব বিস্তার করিয়াছেন। সেবকবৎসল প্রভু আমার—সেবক রক্ষার জন্য কি না করিয়া থাকেন মহারাজ? তাঁহারই করুণাময় নামের—সেবক-সহায় নামের—দীন-দয়াময় নামের জয় দিন মহারাজ! জয় দিন।

উভয়ে এইরূপ বলাবলি করিতে-করিতে দারুব্রহ্মের দিকে

চাহিয়া দেখেন,—অহো, আর তাঁহার মস্তকে কেশ নাই, সে কেশের রাশি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! পতিতপাবনের এই অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া নরনাথের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি তখন গদগদ-কণ্ঠে প্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—গোঁসাই হে! তুমি সব করিতে পার। তোমার মহিমার পার দেবতাগণই প্রাপ্ত হন না, সামান্য মানব আমি কি-ই বা জানিব বল? প্রভু! তুমি তো সকলেরই প্রভু। তোমার তো পর-অপর নাই। তাই বলি, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর,—কৃপা করিয়া আপন ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার কর। এই বলিয়া তিনি বারংবার প্রভুকে প্রণাম করিলেন। তার পর বাহিরে আসিয়া অনেক দান-পুণ্য করিলেন, দুই হাতে করিয়া ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। প্রভুর সেবকগণকে ডাকিয়া সহস্রসহস্র মুদ্রার ভোগ লাগাইলেন। সে মহাপ্রসাদ ভোজনের মহামহোৎসবই বা দেখে কে! তার পর তিনি প্রসন্ন-মনে আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীজগদ্বন্ধু মহাপাত্র প্রভুর বলিহারি দিয়া নিয়মিত সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য সকলে ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। সকলেই বলেন,—জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়,—জয় ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির জয়,—জয় অনাথের নাথ জগন্নাথের জয়।

গোবিন্দ দাস।

এ সংসারের ভাল-মন্দ কিছু বুঝা যায় না। আজ যাহা ভাল, কাল তাহা মন্দ। আজ যাহা আমার একমাত্র আসক্তির সামগ্রী, কাল আমি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করি। ইহা সামগ্রীর স্বভাব, কি আমার মনের স্বভাব, কি বলিব? বোধ হয়, যাহাকে ভাল বাসিলে সে আর কখনও মন্দ হইতে জানে না; যে এখনও যেমন, তখনও তেমন, সেই চির-নূতন চির-প্রীতিনিকেতন সামগ্রী এ জাগতিক সামগ্রীর মধ্যে নাই। তাই এখানকার কোন পদার্থই আমাদের চির-প্রিয় চির-মধুর হয় না। সেই নিমিত্তই তো উত্তর-খণ্ডবাসী গোবিন্দদাস আজ গৃহত্যাগী! অত যে তাঁহার সংসারে আসক্তি, আজ তাহা স্রোতের বেগে তৃণের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের সাজান ঘরকরণা;—স্ত্রী ছিল, একটি কন্যা দুইটি পুত্র ছিল, রোজকারপাতী ছিল, বার মাসে তের পার্ব্বণ ছিল,—বাগান-বাগিচা কোঠাবালাখানা সবই ছিল। কিন্তু এ সকল অধিক কাল তাঁহার মন মজাইতে পারিল না; কি জানি কিসের জন্য তিনি সকল ছাড়িয়া উধাও হইয়া ছুটিলেন। কেবলই ভাবেন—হায়, আমার জীবনে ধিক্। এতটা দিন বৃথাই অতিবাহিত করিলাম! বিনা-সূতার বাঁধনে আবদ্ধ রহিয়া,—মুখে মুখোস লাগাইয়া রহিয়াছি! হায়, এখানকার সবই তো ছেলেখেলার ঘরই দেখছি। এখানকার কেহই তো কাহারও

নয়? যত দিন দেহ সমর্থ, যত দিন গুণের বিকাশ, যত দিন ধন-সম্পদ, এখানকার আদর তত দিন—আপনার গৃহেও প্রভুত্ব তত দিন। কিন্তু একবার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হইলে হয়, তখন আর অর্থ-উপার্জ্জনের সামর্থ্য থাকে না, পুরজনের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা থাকে না, বিদ্যাদিরও স্ফূর্ত্তি হয় না, ফলে তখন কাহারও কোন স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারা যায় না; কাজেকাজেই তখন বন্ধু বিগড়াইয়া যায়,—সকলেই শত্রু হইয়া পড়ে। বুড়ো মানুষ, কথায়-কথায় ভ্রম,—কি করিতে কি করিয়া বসে, তাহার প্রতি-কার্য্যেই তখন সকলের রাগ,—সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপ—নাকে হাত দিয়া হাসি। অধিক কি, নিজের হস্তে উপার্জ্জন করা ধনেও তাহার আর তখন অধিকার থাকে না; সে ধন তখন তাহাকে ছুঁইতেও মানা,—দেখিতেও মানা। তাহার কিছু খরচ করিলে তো আর রক্ষাই নাই; তখন বুড়ার মান বজায় রাখা কঠিন। তখন সে বুড়াও যা, আর একখানা শুক্‌ণা কাঠও তা। হায় কি সর্ব্বনাশ, আমি এই গৃহবাসেই ফাঁসিয়া গিয়াছি? অহো কি ভ্রান্তি; ছার সংসার-রসে রসিয়া আমি কি না সেই সারাৎসার শ্রীহরিকে ভুলিয়া রহিয়াছি? হায়, একবারও মনে হয় না যে, যিনি এই জগতের কর্ত্তা, সকল জীবের অন্নদাতা, তাঁহাকে একবার ভাবি? হায়, এ ভাবও একবার প্রাণে জাগে না যে,—কামধেনুর মত যিনি সকলের সকল কামনা পূরণ করেন, যিনি কর্ম্মরজ্জু ধরিয়া সকলের জন্ম মৃত্যু ও স্থিতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, সেই ভাবগ্রাহীকে একবার ভাবি? কই, এমনও তো একবার মনে হয় না যে,—

এ পাপজীবনকে পুণ্যময় করিতে,—এ মরুপ্রান্তরকে কোকিল-কূজিত ভ্রমর-গুঞ্জিত নন্দন-কাননে পরিণত করিতে,—এ কালকূট-হলাহলকে অমৃতে অমৃত করিতে, যিনি বিনা অন্য কেহ পারেন না,—সেই মধুর-মধুর বড়ই মধুর,—সেই নূতন-নূতন নিতুই-নূতন,—সেই আপন-আপন সদাই আপন ঠাকুরকে ভজি? নাঃ—আর না; আমি আর এ গৃহবাসে থাকিব না। যাই,—আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা ঐ—ঐ আমায় আহ্বান করিতেছেন, আমি তাঁহারই উদ্দেশে যাই। ছার গৃহবাস,—ছার আত্মীয়-কুটুম্ব,—ছার ধনরত্ন; থাক্—থাক্—উচ্ছিষ্ট পত্রের মত পড়িয়া থাক্, আমি চলিলাম! আমার প্রাণের ভিতর সেই "রসিয়া বাঁশিয়া বদন" ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সেই কুলনাশী ডাকাতিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে; আর কি আমি রহিতে পারি? যাই,—যাই সেই আনন্দকন্দ নন্দনন্দনের পদারবিন্দ সেবন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিগে।

গৃহের বাহির হওয়া বড় সহজ কথা নয়। 'হইব হইব' মনে করে অনেকে, কিন্তু হইয়া পড়া অতি কঠিন। হইয়া পড়িলেও বজায় রাখা আবার আরও কঠিন। 'গ্যাস' বা ধোঁয়ার জোর কম হইলেই ফানুষটা উঠিতে-উঠিতে নামিয়া পড়ে; কিন্তু পূরা 'গ্যাস' হইলেই উধাও হইয়া উড়িয়া যায়। এ কার্য্যেও সেইরূপ পূরা গ্যাসের প্রয়োজন;—ঈশ্বরে ও তাঁহার শক্তিতে বিশ্বাস, বৈরাগ্যে বিশেষরূপ দৃঢ়তা এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। জিতেন্দ্রিয় গোবিন্দদাসের এইরূপ দৃঢ়তা এইরূপ ঈশ্বর-বিশ্বাসই

জন্মিয়াছিল, তাই তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় নাই; গৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভালবাসার ধর্ম্ম,—যখন যাহাকে ভাল বাসা যায়, তখন তাহার স্থানটা পর্য্যন্ত মিষ্ট লাগে;—তাহার একটু সম্বন্ধ-গন্ধ পাইলেই মধুলুব্ধ মধুকরের মত সেইখানেই উড়িয়া যাইতে প্রাণ চায়; তাই যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন, তাঁহারা যেখানে-যেখানে তাঁহাদের ভালবাসার সম্বন্ধ পান, সেখানে-সেখানেই ভ্রমিয়া বেড়ান। আহা, এই সেই ধীরসমীর, এই সেই যমুনা-পুলিন, এই সেই নিকুঞ্জ-কানন, এই সেই রাসস্থলী,—এই সকল স্থলেই নিত্যলীল প্রভু আমার বিচরণ করেন; আহা, তাঁহার প্রীতির স্থলে বেড়াইতে-বেড়াইতে যদি কোথাও তাঁহার একবার দেখা পাই, তবেই তো আমার সকল সাধ সকল আশা পূর্ণ হইয়া যায়; আহা, এ সকল স্থান কি মিষ্ট কি মিষ্ট!—এইরূপ ভাবিয়াই পরমার্থভিখারী ভাগবতগণ তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহারা যে তীর্থেই গমন করুন না কেন, সেইখানেই যেন তাঁহাদের প্রাণারাধ্য দেবতার সেইস্থানের উপযুক্ত লীলাসক্ত মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে খেলিয়া বেড়ায়, আর তাঁহারাও আনন্দে-আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন;—লীলার অনন্ত বারিধির বিচিত্র লীলাতরঙ্গ দর্শনে ভাব-বিভোর হইয়া পড়েন। গোবিন্দদাসের তীর্থ-ভ্রমণও সেই নিমিত্ত।

উচ্চৈঃস্বরে হরিহরি বলিতে-বলিতে তিনি চলিয়াছেন। নির্ম্মম নিরহঙ্কার ভাব। মান-অপমান নাই। সকল জীবেই সমান দৃষ্টি;

তা ছোটই বা কি আর বড়ই বা কি। প্রাণ আনন্দেই পূর্ণ। আহারের প্রয়াস নাই; যে দিন যেমন জোটে। উত্তম শালি-অন্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, দধি, সর, মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্বাদু আহার জুটিলেও যা, ফল-মূল জুটিলেও তা-ই; আবার কিছু না জুটিলেও সেই ভাব। জলেরও বিচার নাই;—তা নদীরই হউক, পুষ্করিণীরই হউক, কিংবা কূপাদি যাহারই হউক, পিপাসার সময় একটু পাইলেই হইল। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, বৃক্ষমূলেই বাস। কোন কিছুর কামনা নাই; দুঃখ যে কাহাকে বলে, তাহার অনুশোচনাও নাই। এইরূপে তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িল, যেন অকালের কাঙ্গাল। দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়। কাছে আসিলে সকলেই বলে,—আ-মোলো, এ পাগোলটা আবার কোথা থেকে এসে জুটলো?—দূর্ দূর্ মার্ মার্; সাবধান হে সাবধান, এখনই কারুর কিছু চুরি কোরে নিয়ে পালাবে। এইরূপ দুর্ব্বাক্য বোলে সকলেই তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। তাঁহার তাতে দুঃখ নাই, ক্ষোভও নাই। বলেন,—

"বোলে—মো পূর্ব্ব কর্ম্ম যেতে। সে সিনা করি অছি এতে?
ভল বা মন্দ হানি লাভ। যে পূর্ব্ব অরজন থিব॥
কে তাহা অন্যথা করিব? সে তাহা অবশ্য ভুঞ্জিব॥"

আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মই তো আমাকে এইরূপ নির্য্যাতন করাইতেছে? ভাল হউক মন্দ হউক, হানি কিংবা লাভই হউক, পূর্ব্বের যাহা অর্জ্জন করা থাকিবে, কে তাহা অন্যথা করিবে? তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। আমার কৃত কর্ম্মের ফল

অন্য কেহ তো আর ভোগ করিতে আসিবে না? ইহাতে অকারণ লোকের দোষ দিতে যাইব কেন? কাহারও উপর রাগই বা করিতে যাইব কি নিমিত্ত?

গোবিন্দদাস এইরূপে একেএকে গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, প্রভাস, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, পুরুষোত্তম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ পর্য্যটন করিয়া একদিন মনেমনে ভাবিলেন,—এইবার শ্রীলছমন দেবকে দর্শন করিতে যাইতে হইতেছে; তা তাহাতে যতই ক্লেশ হউক,—প্রাণ থাকুক আর যাউক। হায়, কতদিনে আমি তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিব? কতদিনে আমার জন্মবন্ধন বিমোচন হইয়া যাইবে? এইরূপ ভাবিতেভাবিতে তিনি লক্ষ্মণ-ক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি তৈর্থিক সাধুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, দক্ষিণদেশের লক্ষ্মণদেব মহাপ্রতাপী; তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিলেই অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

এইরূপে কিছুদিন যাইতে-যাইতে তিনি সেই ক্ষেত্রসীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন। পথ অতি দুর্গম,—জনমানবহীন হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্য। একাকী—সঙ্গে কেহ নাই; তিনি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন বর্ষাকাল। পিচ্ছিল পথ। শক্তিহীন বৃদ্ধশরীর লইয়া তিনি ধীর-পদবিক্ষেপে সেই পথে অবিশ্রান্ত চলিতেছেন;—বারংবার পড়িতেছেন, উঠিতেছেন। তথাপি চলিবার বিরাম নাই। বৃষ্টিতে তাঁহার শরীর ক্রমশ

অবসন্ন হইয়া পড়িল, জরাজীর্ণ ক্ষীণ তনুখানি শীতে থরথর কাঁপিতে লাগিল। দন্তে-দন্তে ঠক্‌ঠকি ধ্বনি হইতে থাকিল। জিহ্বায় জড়তা আসিয়া গেল; ক্রমেক্রমে বাক্‌শক্তিও বিলুপ্ত হইল। তখনও বৃদ্ধ ধীরেধীরে চলিতেছেন। কিন্তু এ ভাবে আর অধিকক্ষণ চলা চলিল না; তিনি এক বৃক্ষতলে পড়িয়া গেলেন; আর উঠিতে পারিলেন না। শরীর অবসন্ন হইলেও কিন্তু তাঁহার মন অবসন্ন হয় নাই। তাহার বল তখনও সমান, কি বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাস সেই মনের আসনে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া, মনেমনেই বলিতে লাগিলেন,—ভগবন্! তুমি করুণার কনকগিরি। তুমি সকল জীবের গুরু জ্ঞানদাতা,—হিতসাধক—মাতা পিতা; তোমাকে আর আমি কি বলিব? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর তুমি, তোমার তো অজ্ঞাত কিছুই নাই? প্রভু! তুমি সেই রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের অমুজ; তোমার তেজ কোটিসূর্য্য অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল, রূপ কন্দর্পের দর্পনাশক; এ জগতে তোমার তুলনা মিলে না। আর্ত্তের আর্ত্তি ভীতজনের ভীতি বিনাশ করিবার নিমিত্ত তুমি যুগল করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। এই জন্যই তো তোমার অবতার মহিমময়! তুমি সাক্ষাৎ সেই অনন্তদেব, তোমার রূপ-গুণাদির অন্ত নাই; তুমি অনন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া,—জীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজ কর; অতএব অন্তর্য্যামী তুমি সকলেরই অন্তরের কথা জানিতে পার। তোমায় নূতন করিয়া জানাইব আর কি? আমি তোমার ঐ অভয় পাদপদ্মে

শরণাগত,—আমার জীবন রক্ষা কর। এ জীবন ভিক্ষা জীবনের জন্য নয়,—জাগতিক তুচ্ছ বিষয় ভোগের জন্য নয়,—জগজ্জীবন তোমার শ্রীমুখ দর্শনের জন্য। অধিক নয়, একবার,—কেবল, একটিবার তোমার চন্দ্রবদন আমাকে দেখাও, তারপর জীবন থাকুক আর যাউক; যা তোমার ইচ্ছা। হায়, এখন যদি একটু আগুণ পাই, তাহার তাপে দেহটাকে ঠিক করিয়া লই; আবার তোমার দর্শনের জন্য প্রধাবিত হই। আগুণ একটু মিলে না কি?

গোবিন্দদাস বৃক্ষতলে শুইয়া-শুইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন; রামানুজ লক্ষ্মণ তাহা জানিতে পারিলেন। শরণাগতির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি; তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; ভৃত্যের উদ্দেশে বেগে ধাবিত হইলেন। তিনি এক শবরের রূপ ধরিয়া, হস্তে একটি উনুন তাহাতে জ্বলন্ত আগুণ লইয়া তৎপর গোবিন্দদাসের পার্শ্বে রাখিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—আহা, তোমার বড় শীত করিতেছে,—না? এই অনলের তাপ লও, শীতের ভয় দূরে যাইবে।

সেই স্নেহমাখানো স্বরে গোবিন্দদাসের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চাহিয়া দেখেন,—সুন্দর শবরমূর্ত্তি; অদূরে অগ্নিপাত্র,—গনগনে আগুণ জ্বলিতেছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। শবরকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গেলেন; শীত-জড় জিহ্বায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অগ্নির উত্তাপ লইতে গেলেন, শীত-জড় শরীর চালাইতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রুর ধারা বাহির হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টার পর তিনি কাতরকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে,—

অনেকটা আকার-ইঙ্গিতেই বিনয়ভঙ্গীতে শবরকে জানাইলেন,—বাপু হে! আমার অঙ্গ চালাইবার ক্ষমতা নাই; একটু তুলিয়া বসাইয়া দিতে পার?

মায়াশবরও হাসিহাসি-মুখে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলেন, অগ্নির পাত্রটি তাঁহার গা ঘেঁসিয়া স্থাপন করিলেন। তাঁহার শ্রীহস্ত-সংস্পর্শে গোবিন্দদাসের শরীরের অবসাদ দূর হইয়া গেল, বল যেন শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। আর জিহ্বার জড়তা নাই। শরীরের জড়তা নাই। তিনি অগ্নির উত্তাপ লইতে-লইতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বাপু হে! বয়স অনেক হইয়াছে; মরণের জন্য দুঃখ ছিল না। কিন্তু প্রাণের একমাত্র সাধ,—চর্ম্মচক্ষুতে একবার শ্রীলছমন দেবকে দেখিয়া জীবন বিসর্জ্জন করি; সেই জন্যই জীবন রক্ষার বাসনা। নচেৎ এ পাপজীবন যাইলেই ভাল ছিল। তা বাপু! তুমি আজ যাহা উপকার করিলে, তাহা আর কি বলিব। আমি তোমাকে ধর্ম্মত পিতৃ সম্বোধন করিলাম; আজ হইতে তুমি আমার ধর্ম্মপিতা হইলে।

গোবিন্দদাস মনেমনে ভাবিলেন,—এ নিশ্চয় সেই করুণাময় প্রভুরই করুণার বিকাশ; তাহা না হইলে কি এই বিজন অরণ্যে শবর আসিয়া আমার জীবন দান করিত? ধন্য প্রভু! ধন্য তোমার মহিমা!

এইবার গোবিন্দদাসের মনের আনন্দ মুখে ফুটিয়া বাহির হইল। তিনি হাসিহাসি-মুখে শবরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—ওহে ধর্ম্ম-পিতা! তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়? এখান

থেকে কত দূর? কে তোমাকে এখানে পাঠাইল? এই ঘোর বর্ষাকালে তুমি আসিয়া আমার জীবন দান করিলে। তোমার এ উপকার-ঋণ কোটিজন্মেও আমি পরিশোধ করিতে পারিব না! আহা, আমার জন্য তোমার বড়ই ক্লেশ হইতেছে,—না? না না, আর তোমার থাকিয়া কাজ নাই, ভারি কষ্ট হইতেছে বটে। তা তুমি কিছু মনে কোরো না। আমার প্রতি যেন অনুগ্রহ থাকে। গোবিন্দদাসের কথার উত্তরে মায়াশবর আর কিছু বলিলেন না, হাসিতেই প্রতি কথার প্রত্যুত্তর দিয়া হাসিতে-হাসিতে সরিয়া পড়িলেন।

প্রভুর মহিমায় তখন গোবিন্দদাসের অন্তর-বাহির ভরিয়া গিয়াছে। কি-যেন কি-এক নেশার আবেশে তিনি বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তার পর তিনি আবেশ-ভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন,—সেই অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্য হইতে প্রাকৃত রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার শরীরে এখানকার ক্ষুধা-তৃষ্ণার আবির্ভাব হইল। তিনি অসহ্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িলেন। মনেমনে ভাবেন,—এই নিবিড় অরণ্যে ঘর নাই—গ্রাম নাই—বিপ্রগৃহও নাই; আমার অন্ন মিলিবেই বা কোথায়? তিনি মনকে এইরূপে প্রবোধ দিয়া বসিয়া-বসিয়া রাম-কৃষ্ণ-হরি নাম ভজন করিতে লাগিলেন। কৃপার সাগর দীন-বন্ধু তাহা জানিতে পারিলেন। জানিবেন না-ই বা কেন?

"গগন-চাতককু নিতি। বরষা-জল যেহু স্থিতি॥
গর্ভর বালককু অন্ন। যে দেই রথন্তি জীবন॥

কাষ্ঠকীটর পড়িদাতা। তাঙ্কু অপূর্ব্ব কেউ কথা ?"

যিনি শীত-গ্রীষ্ম সকল কালেই আকাশের চাতকপক্ষীকে বরষার জল যোগাইয়া থাকেন; যিনি গর্ভস্থ বালককে অন্নদান করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন; কাষ্ঠের অভ্যন্তরে স্থিত ক্ষুদ্র কীটেরও যিনি প্রতিপালক, তিনি জানেন না, এমন কোন কথা থাকিতে পারে কি? দীননাথ অমনি এক বিপ্র-রূপ ধারণ করিয়া হস্তে বর্ষার প্রীতিপদ খাদ্য গরম-গরম খিচুড়ী, নূতন ভাণ্ডে নানাবিধ ব্যঞ্জন, আচার, দধি, ছানা প্রভৃতি লইয়া ক্ষিপ্রগতি চলিলেন। গোবিন্দদাসের পাশে আসিয়া বলিলেন,—ওহে বিপ্রবর! বসিয়া-বসিয়া ভাবিতেছ কি? অন্ন চাহিতেছিলে না?—এই নাও তোমার জন্য অন্ন আনিয়াছি, উঠিয়া ভোজন কর। শুনিয়া ব্রাহ্মণ তো আর নাই। বিস্ময়ে-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখেন,—সত্যই তো, সুন্দর বিপ্রমূর্ত্তি, উত্তম খাদ্য সামগ্রী, আহা গন্ধে মন মাতিয়া উঠিতেছে; হাত দিয়া দেখেন,—তাই তো গরমও রহিয়াছে; কি বিচিত্র কি বিচিত্র! তিনি হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বলি-বলি করিয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মনে হইতে লাগিল,—জননীর বাৎসল্যরসে যেন সে স্থানটা ভরিয়া গিয়াছে; মা যেন ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের কোলে অন্নস্থালী ধরিয়া দিয়া স্নেহপূত দৃষ্টিতে বারংবার খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। মনে হইল,—একবার জিজ্ঞাসা করি না কেন, শান্ত সৌম্য পুরুষ-মূর্ত্তিতে মায়ের মমতা মাখাইয়া তুমি কে আসিলে হে? কিন্তু আনন্দ-গদ্গদে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তথনও সেই ভোজনের জন্য ইঙ্গিতে উত্তেজনা

সমভাবেই চলিয়াছে। তিনি কি করেন, কম্পিতকরে গ্রাসেগ্রাসে অন্ন উঠাইয়া মুখে দিতে লাগিলেন। অন্ন কতক মুখে যাইতেছে, কতক এদিকে ওদিকে পড়িয়া যাইতেছে; দৃষ্টি সেই চিত্তহারী বিপ্রমূর্ত্তির দিকে। কি খাইতেছেন কিছুই ঠিক নাই। কিন্তু এটা ঠিক—যা খাইতেছেন, তাহাই অমৃত। তাঁহার তখন অন্তর-বাহির সকলটাই অমৃতময়। বোধ হইতে লাগিল, সেই মূর্ত্তিরই দৃষ্টিটা যেন অমৃতে গড়া; সে দৃষ্টি যেখানে পড়িতেছে, সেইখানেই অমৃত-বৃষ্টি হইতেছে।

খাও—খাও গোবিন্দদাস! খিচুড়ি খাও খিচুড়ি খাও। আজ তোমার সকল খাওয়ার শেষের সে দিন, খিচুড়ী খাও। তোমার সাধের ঠাকুর আদর মিশায়ে নিয়ে এসেছেন, খিচুড়ী খাও। খাও—খাও গোবিন্দদাস! খিচুড়ী খাও খিচুড়ী খাও।

আনন্দে-আনন্দে গোবিন্দদাসের খিচুড়ী-খাওয়া শেষ হইয়া গেল। মুখের কথাও ফুটিয়া উঠিল। কথাগুলি কিন্তু মাতালের মত আড়ো-আড়ো। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—তু-তু-তুমি কে বট হে? কো-কো-কোথা থেকে এলে বল দেখি, কে বট হে? ক্ষু-ক্ষু-ক্ষুধা পেয়েছে, কে বোলে দিল, তু-তু-তুমি কে বট হে? বা-বা-বামুন বোলে আমার বোধ হয় না, তু-তু-তুমি কে বট হে? বো-বো-বোধ হয় তুমি মোর লক্ষ্মণ, ব-ব-বল-বল তাই না কি হে? বলিতে-বলিতে বাষ্পবেগে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। নয়নে প্রেমাশ্রুর পবিত্র

প্রবাহ। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—তুমি আমার তাই বটে, তাই বটে। যাঁহার মায়া দেবতারও অগোচর, ছার মানব আমি তাঁহার স্বরূপ জানিব কি প্রকারে? কৃপাময়! কৃপা করিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া যাউক। না দাও তো নিশ্চয় জানিও—আমি তোমার সম্মুখেই আত্মঘাতী হইব।

দয়াময় সকলই দেখিলেন, সকলই শুনিলেন; ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সুস্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলিলেন,—গোবিন্দ-রে! ঠিকই ঠাওরাইয়াছ, আমিই সেই তোমার রামানুজ লক্ষ্মণ। ধন্য—ধন্য তোমার অনুভবশক্তি, ধন্য—ধন্য তোমার ভাব-ভক্তি। হাঁ, তুমি যথার্থ ভক্ত বটে, সংসার-সাগরের পারে যাইবার উপযুক্ত পাত্র বটে। আমি তোমার ভাব-মূল্যে কেনা হইয়া গিয়াছি, এখন বল কি করিতে হইবে? যাহা বলিবে, তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

প্রভুর শ্রীমুখের কথা তো নয়, যেন অমৃতের ঝরঝর প্রস্রবণ। শুনিয়া গোবিন্দদাসের কাণ-প্রাণ জুড়াইয়া গেল। তিনি যে তখন কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না;—শাল্মলী-তরুর ন্যায় কণ্টকিত কলেবরে প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। বারংবার প্রণাম করিয়া সাধ আর মিটে না। উঠিয়া কপালে করযুগল রাখিলেন। প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কাকুতি-মিনতি করিয়া কহিলেন,—ওহে অনাদি-কারণ পরমপুরুষ ভগবন্! তোমাকে প্রণাম—প্রণাম। আমার

চাহিবার আর কিছুই নাই; যাহা পাইবার, চাহিবার আগেই তাহা পাইয়াছি। দয়াময় তোমার এতই দয়া। কিন্তু প্রভু! মহাপাতকী মানব আমি; সংশয় যে আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না; তোমার কৃপা-বৈভব পদেপদে অনুভব করিয়াও তো বেশ বুঝিতে পারিতেছি না যে—তুমিই আমার সেই রঘুবংশ-শিরোভূষণ লক্ষ্মণ। কৃপাময়, যদি এত কৃপাই করিলে, তবে আর একটু কৃপা করিয়া তোমার সেই ধনুর্ব্বাণপাণি শ্রীমূর্ত্তি একবার আমাকে দেখাও, আমার মনের সকল সংশয় ছুটিয়া যাউক,—প্রাণের সকল সাধ মিটিয়া যাউক।

ভক্তাধীন ভগবান্ তাহাই করিলেন,—ভক্তবাঞ্ছা পূরাইবার নিমিত্ত নিজ রামানুজ-রূপই ধারণ করিলেন। আহা কি মনোহর রূপ!—

"তনু কনকপ্রায় বর্ণ। গউর অঙ্গ শোভাবন॥
মুখ সম্পূর্ণ ইন্দু জিনি। কি আহাল্লাদ সে চাহানি॥
চক্ষু-শ্রবণ-নাসা-শোভা। কিস উপমা তহিঁ দেবা॥
রঙ্গ অধরে মন্দ হাস। সুন্দর শোহে পীতবাস॥
কম্বু আকৃতি গ্রীবামূল। অতি বিস্তার হৃদস্থল॥
কটি-ক্ষীণতা কহি নোহে। কি শোভা পাদপদ্ম দুহেঁ॥
বলিন শ্রীভুজে কোদণ্ড। তেজে গঞ্জই মারতণ্ড॥
শিরে সপত মণি সাজে। দুতী ঈশ্বর প্রায়ে বিজে॥"

কিবা কনক-কমনীয় কান্তি! কিবা গৌর অঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা! কিবা পূর্ণচন্দ্র বিজয়ী বদন! কিবা আনন্দমাখা চাহনী! কিবা নিরুপম চক্ষু কর্ণ নাসিকা! কিবা রক্তিম অধরে মন্দমন্দ

হাস্ত! কিবা শোভন পীতবসন! কিবা শঙ্খের মত ত্রিরেখাঙ্কিত গ্রীবামূল! কিবা বিশাল বক্ষঃস্থল! কিবা কেশরী জিনিয়া ক্ষীণ কটি! কিবা সুন্দর পাদপদ্ম-যুগল! কিবা শ্রীহস্তে সূর্য্যতেজের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী উজ্জ্বল ধনুর্ব্বাণ! কিবা মস্তকে সপ্ত মণির মহার্হ মুকুট! আহা, যেন সেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় মূর্ত্তিই বিজয় করিয়াছেন! এই অপরূপ রূপ দর্শনে গোবিন্দ-দাসের নয়নযুগল প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইল। সকল শরীর পুলকে পূরিয়া গেল। দেহে ঘনঘন ঘর্ম্মোদ্গম হইতে লাগিল। তিনি গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ওহে ভাবগ্রাহি! তোমাকে প্রণাম করি। হায় হায়, তোমার মত দয়াল ঠাকুর থাকিতে, লোকে আবার একে ওকে কেন যে ভজনা করে, কিছুই বুঝিতে পারি না। হায় হায়, তাহাদের জীবনে ধিক্—জীবনে ধিক্। বৃথাই তাহাদের দেহভার-বহন। হায় প্রভু! মূর্খ আমি; তোমার এ সেবকবাৎসল্যের সমাচার অগ্রে আমার জানা ছিল না। আজ আমি তোমার কৃপায় নিস্তার লাভ করিলাম নিস্তার লাভ করিলাম। এইরূপ বলিতে-বলিতে গোবিন্দদাস ভাব-বিভোর হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রকান্ত মণি যেমন চন্দ্রদর্শনে দ্রবীভূত হইয়া যায়, তিনিও তেমনি শ্রীপ্রভুকে দেখিয়া কেমন যেন আলুথালু গদগদ হইয়া পড়িলেন। এইবার তাঁহার সকলই কোমল—সকলই মোলায়েম; খিচ্খাচ্ কিছুই নাই। এইবার তিনি প্রভুর সঙ্গে আপনাকে বেশ মাখামাখি মিশামিশি করিয়া ফেলি-লেন। তাঁহার সকলটাই তখন প্রভুময় হইয়া উঠিল। কালও

তাঁহার পূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার মাটীর দেহ মাটীতে পড়িয়া গেল; সঙ্গেসঙ্গে দিব্যদেহে তিনি শ্রীবিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। সহসা কি-এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিমল জ্যোতিতে সেই অরণ্য-ভূমি আলোকিত হইয়া পড়িল। তা দেখিয়া বনের পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেই কি-এক অদ্ভুত ধ্বনি করিয়া উঠিল;—বন-ভূমির বৃক্ষে-বৃক্ষে কুঞ্জে কুঞ্জে লতায়-লতায় পাতায়-পাতায় ফলে-ফলে ফুলে-ফুলে গুল্মে-গুল্মে তৃণে-তৃণে সেই স্বরলহরী খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্তের দিব্যগতি দর্শনে আজ সমগ্র বনভূমিই যেন ভক্ত ও ভগবানের প্রীতিতে হরিহরি জয়জয় ধ্বনি দিয়া উঠিল।

গীতা-পণ্ডা।

যাঁর টান যেদিকে। কেহ বা বিষয় বৈভব ভালবাসে, কেহ বা কামিনীর কুটিল কটাক্ষেই প্রীতি অনুভব করে, কেহ বা পরমার্থ-চিন্তাতেই পরম আনন্দ পাইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা জীবিকা। দুইটী কন্যা, একটী পুত্র ও ধর্ম্মপত্নী লইয়া তাঁহার ধর্ম্মের সংসার। তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃত গীতা-মকরন্দ-পানেই সর্ব্বদা বিভোর। গীতাই তাঁহার ধ্যান, গীতাই তাঁহার জ্ঞান, গীতাই তাঁহার জপ, গীতাই তাঁহার তপ, গীতাই তাঁহার তন্ত্র, গীতাই তাঁহার মন্ত্র। তিনি ভবপারে যাইবার তরণীরূপে একমাত্র গীতাকেই অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিদিনই তিনি সম্পূর্ণ আঠার অধ্যায় গীতা সুমধুর-স্বর-সংযোগে গান করেন। তদনন্তর ভিক্ষার আশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া যাহা-কিছু প্রাপ্ত হন, পত্নীর হস্তে অর্পণ করেন। পাককুশলা পত্নীও তাহা পরমানন্দে রন্ধন করেন এবং গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

এইরূপ আনন্দেই দিন যায়। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিত্য নিবাস হইলেও তথায় তাঁহাদের নাম বড়একটা কেহ জানে না। গীতার গায়ক বলিয়া ব্রাহ্মণকে 'গীতা-পণ্ডা' বলিয়া সকলে ডাকিয়া থাকেন,—একটু ভক্তি-শ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যে

কেবল তোতা পাখীর মত গীতা পাঠই করিয়া থাকেন তাহা নহে, তিনি আপন ভক্তিশ্রদ্ধার প্রভাবে গীতার মর্ম্মার্থও অবগত হইয়াছিলেন। তাই সর্ব্বদাই মনে করিতেন,—এ সংসারে সকলই মিথ্যা!—

"এ যেউ পুত্র দারা ধন। এ সর্ব্ব মায়ার বিধান॥
কেহি যে নুহই কাহার। কেবল ভ্রম মাত্র সার॥"

পুত্র, দারা, ধন এ সকলও সেই মায়ারই লীলায়িত। এ সংসারে কেহই কাহার নহে, 'আপন আপন' বলিয়া বুদ্ধিটা কেবল একটা ভ্রম মাত্র। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি শ্রীহরির ভজনই একমাত্র সার করেন। সাংসারিক সুখ-দুঃখ শোক-মোহ প্রভৃতি তাঁহাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। ভজনানন্দেই তাঁহার প্রাণে সদা আনন্দ।

এইরূপে কিছুদিন যায়। দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দুইচারি গ্রাম ভ্রমণ করিয়াও এক মুষ্টি অন্ন মিলে না। পতি-পত্নীতে আজ কয়েকদিন উপবাসী। অতি কষ্টে শিশুদের খাদ্য সংগ্রহ হইতেছিল। সেদিন ব্রাহ্মণ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া হায়রাণ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কোথাও কিছুই পাইলেন না। তজ্জন্য মনে কিছু দুঃখ নাই। ভাবেন,—অদৃষ্টে পাইবার ছিল না তাই পাইলাম না। পাইবার হইলে পাইতাম বই কি? তজ্জন্য আর বৃথা চিন্তা কেন? প্রাণ ভরিয়া শ্রীহরির ভজন করি। সকলের প্রভু তিনি, যাহা করিবার তিনিই করিবেন।

সে দিনটা সকলেরই উপবাসেই কাটিয়া গেল। পরদিন

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ স্নান করিলেন, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিলেন। তাহার পর দুই হস্তে গীতার পুঁথিখানি ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তিনি একএকটী শ্লোক পাঠ করেন, হৃদয়ে তাহার অর্থের স্ফুর্ত্তি হইতে থাকে, আর অমনি অঙ্গে পুলকাবলি উত্থিত হয়, নেত্রে জল-ধারা বহিয়া যায়, কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আইসে, অধর-দশন থরথর কম্পিত হইতে থাকে। কখনও বা ব্যাকুল-স্বরে উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠেন,—ওহে ভগবন্, আমি মহা পাতকী, মহা অপরাধী, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়; কৃপা করিয়া আপন বলিয়া অঙ্গীকার কর। তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। এইরূপ বলিতে-বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। গীতার পুঁথিখানি হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। নির্ব্বাতদীপের ন্যায় নিশ্চল আসনে তিনি বসিয়া রহিলেন।

এ দিকে হইয়াছে কি, ব্রাহ্মণের শিশু পুত্র এবং কন্যা দুইটী ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া মহা কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সেই করুণ ক্রন্দনে জননীর হৃদয়ে বজ্র-বেদনা উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাঁদিতে-কাঁদিতে পতির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের এ অবস্থায় পত্নী অন্য দিন তাঁহাকে কোন কথাই বলিতেন না, তাঁহার সাধন-ভজনের ব্যাঘাতও জন্মাইতেন না। কিন্তু আজ ক্ষুৎপীড়িত পুত্র-কন্যার উত্তেজনায় তিনি এ অবস্থাতেও পতিকে উত্ত্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রন্দনমিশ্র

উচ্চস্বরেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—ওগো, তুমি ত গীতা গীতা করিয়াই পাগল হইলে, কিন্তু এদিকে যে ছেলে-পুলেরা ক্ষুধায় আকুল। তাহাদের দুঃখ যে আর আমি দেখিতে পারি না; যাও, তুমি শীঘ্র কোথা হইতে কিছু যোগাড় করিয়া আন, নচেৎ বাছাদের আর বাঁচাইতে পারিব না। হায়! বাছাদের মুখ দেখিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি। তাহারা মরিলে আমি আর কি সুখে বাঁচিয়া থাকিব। মরণের পথ আমাকেও ধরিতে হইবে। ব্রাহ্মণীর বাক্যে ব্রাহ্মণের সাধের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া তিনি পত্নীকে বলিলেন,—ছিঃ মরিবে কেন?—

"সবুরি কর্ত্তা ভগবান। অবশ্য দেবেটি ভোজন॥"

ভগবান্ সকলেরই কর্ত্তা; তিনি কি আর উপবাসীই রাখিবেন? ভোজন তিনি দিবেনই দিবেন।

সময়ের গুণে পতির এই অমূল্য উপদেশ পত্নীর অন্তরে স্থান পাইল না। তিনি এ কথায় আশ্বস্ত না হইয়া বরং কিছু কুপিত হইয়া পড়িলেন। হাত নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, —নাও, তোমার ওসব তত্ত্বকথা এখন রেখে দাও। ফাঁকা কথায় আর পেট ভ'চ্চে না। তুমি এখানে বসিয়া-বসিয়া মরিয়া যাও, আর তোমার ঘরে ধনের জাড়ি হুড়হুড় করিয়া হাজির হইবে। ক্ষেপামির কথা আর কি!

ব্রাহ্মণ সেইরূপ হাসিতে-হাসিতেই আবার বলিলেন,—সুন্দরি, অত কাতর হ'ও না—কাতর হ'ও না। আমি যাহা বলি, তাহা একটু বেশ মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বুঝে দেখ দেখি।—

"সবুরি জীবর জীবন। অটন্তি প্রভু ভগবান॥
দেখ এ গীতা মধ্যে সার। শ্রীমুখ-আজ্ঞা প্রভুঙ্কর—॥
সমস্ত কর্ম্ম পরিহরি। যে মোর পাদে আশ্রে করি॥
তাহার নির্ব্বাহর ভার। কন্ধরে রহিছি মোহর॥
নিত্যে লাগই তাকু যেতে। সে চিন্তা কাহিঁ অছি তোতে॥
একথা অটই প্রমাণ। বোলি অছন্তি নারায়ণ॥"

দেখ সখি, সেই প্রভু ভগবান্ সকল জীবেরই জীবন। তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা একবার শুন দেখি। এই গীতার মধ্যেই তাঁহার সার উপদেশ একবার দেখ দেখি। ভক্তবৎসল প্রভু আমার উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছেন,—যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার চরণ আশ্রয় করে, তাহার নির্ব্বাহের ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত। তাহার যে দিন যাহা লাগিবে, সে চিন্তা তাহাকে করিতে হইবে কেন, আমিই তাহা চিন্তা করিয়া থাকি,—আমিই তাহা নিত্য যোগাইয়া থাকি। পতিব্রতে, এ কথা সেই নারায়ণেরই কথা। এ কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিও। তাঁহার কথা—সেই সত্যস্বরূপ শ্রীহরির কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আর এ সংসারে সত্য আর কি আছে সুন্দরি! স্বতঃপ্রমাণ বেদবাণী যাঁহার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, সেই বেদপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ ভগবানের কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে আর কাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, কোন্ ধ্রুব নক্ষত্র ধরিয়া, এই ভবসাগরের পর-পারে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইব? এ কথার উপর আর কোপের অবকাশই বা কোথায়?

পতির সুমধুর উক্তি পত্নী শুনিলেন,—কিন্তু তাঁহার মন

তাহাতে মানা মানিল না। তিনি সেই কোপের স্বরেই বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ গো হাঁ, তোমার এ কথা কোন্ যুগের কথা? ও সেই দ্বাপরযুগের কথা। এটা হ'চ্চে কলিযুগ। এ যুগে আর অমনটি হ'তে হয় না যে, জগন্নাথ কাঁধে ভার ক'রে তোমার ঘরে তোমার দরকারি জিনিষ এনে হাজির ক'রে দেবেন, আর তুমি ব'সে-ব'সে দুই হাতে তুলে কপ্ কপ্ ক'রে ভোজন ক'র্‌বে। আমি এখনও ব'ল্‌ছি তুমি ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। ওরূপ দুঃসাহসের বালির বাঁধে তুমি এ মরণের স্রোত কিছুতেই আট্‌কাতে পার্‌বে না। এখনও সময় আছে। চেষ্টা-চরিত্র ক'র্‌লে খোরাক যোটাতে পা'র্‌বে,—মৃত্যু-মুখ হ'তে সকলকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে।

এ সংসারে সকলই সহিতে পারা যায়, কিন্তু ভালবাসার সামগ্রীর অপমান কিছুতেই সহা যায় না। প্রাণপ্রিয় গীতার কথার এরূপ মুখেমুখে প্রতিবাদ-অমর্য্যাদা ব্রাহ্মণ আর সহিতে পারিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইলেন। তাড়াতাড়ি গীতার পাতা উল্‌টাইয়া—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"—

শ্লোকটি বাহির করিলেন এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক পত্নীকে দেখাইয়া বলিলেন,—অয়ি দুষ্টে! হায় হায়, তুই এই প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞাকে অবমাননা করিলি? আচ্ছা, যদি তোর মিছা বলিয়াই ধারণা, তুই কি ইহা চিরিয়া ফেলিতে পারিবি? উত্তরে

পত্নী বলিলেন,—তা কেন পার্‌ব না? তালপাতার পুঁথি বইত নয়; নিয়ে এস, একবার কেন একশত বার চিরে দেবো এখন। এই বলিয়া যুবতী রাগে গরগর করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কোপ-মনে অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া সেই শ্লোকস্থান দেখাইয়া দিলেন, রমণীও লৌহলেখনী ধরিয়া সেই শ্লোকের উপর তিনটা রেখা টানিয়া চিরিয়া ফেলিলেন।

ব্রাহ্মণের বিশ্বাস ছিল না যে, তাঁহার পরিণীতা পত্নী এরূপ অপকর্ম্ম করিতে পারেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি উচ্চ কাতর চীৎকার করিয়া মস্তকে করাঘাত করিতে-করিতে বলিয়া উঠিলেন,—হায় হায়, কি করিলাম কি করিলাম? আমি প্রভুর কাছে অপরাধী হইলাম? হায়, আমি আবার আপন নয়নে এই দৃশ্য দর্শন করিলাম? ছার প্রাণ এদেহে এখনও রহিয়াছে? না, আর না, আর এখানে না; এ পাপ ক্ষেত্রে আর না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। মনের ভাব,—গৃহত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া যাইবেন। কিন্তু উপবাসে ও মানসিক ক্লেশে শরীর এতই অবসন্ন যে, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। তিনি পার্শ্বগৃহে গমন করিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার রোদনের আর বিরাম নাই, শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা-ভিক্ষারও বিরাম নাই। তাঁহার পত্নীও বালকবালিকাগণকে সঙ্গে লইয়া গম্ভিরী-মধ্যে (গর্ভ-গৃহে) যাইয়া ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িলেন। শরীর কোপের

প্রকোপে থাকিয়া-থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, অন্তরে গুরুতর চিন্তা—তাইত পুত্রকন্যাদের দশা কি হইবে? অশান্তির আর, অন্ত নাই।

এ দিকে হইল কি, সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ ব্রাহ্মণের অন্তরের কথা সকলই জানিতে পারিলেন। দীনবন্ধু অমনি ভক্তের ব্যথায় ব্যথিত-হৃদয়ে ত্বরিতগতি তাঁহার আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ যাত্রাটা আবার যেমন-তেমন নয়—অলক্ষ্যে-অলক্ষ্যেও নয়; প্রকাশ্য রাজপথে প্রকাশ্য মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে গমন করিতে হইল। কি করেন, ভক্তের জন্য যে তাঁহাকে সকলই করিতে হয়। ভক্তের জন্যই যে তাঁহার মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ রূপ ধারণ, ভক্তের জন্যই যে তাঁহার নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ, ভক্তের জন্যই যে তাঁহার হয়গ্রীবমূর্ত্তির আবির্ভাব। ভক্তের জন্য তিনি না করেন কি?

এবার ব্রাহ্মণের জন্য তাঁহাকে যে বেশ ধারণ করিতে হইল, তজ্জন্য তাঁহাকে বড় বেগ পাইতে হইল না। গোয়ালার ছেলে গোয়ালার মূর্ত্তি ধরিতে আর ক্লেশটা কি? নন্দমহারাজের বাধা বহিয়া-বহিয়া যিনি চির-অভ্যস্ত, তাঁহার আর সামান্য অন্য পদার্থ কাঁধে করিয়া বহন করিতে লজ্জাই বা কি? সকলে দেখিল, একজন অল্পবয়স্ক গউড় (গোয়ালা) কাঁধে ভার লইয়া হনহন্ করিয়া কোথায় চলিয়াছে। ভারবাহক গোপবালক হইলেও এ গোয়ালা যেন আর কোন্ দেশের গোয়ালা! ভাগ্যবশে যাহার নয়ন তাঁহার উপরে পতিত হয়, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না। সে যেন

কোন যাতুমন্ত্রে মোহিত হইয়া পড়ে। আহা কি সুন্দর সে গোপবালক-মূর্ত্তি!—

"নবীন নীল ঘন মূর্ত্তি। সুইন্দ্র-নীলমণি কান্তি॥
বদন পূর্ণ শশধর। পঙ্কজ নয়ন রুচির॥
অতি সুরঙ্গ বিম্বাধর। সুপর্ণ নাসা মনোহর॥
মুখে প্রকাশ মন্দ হাস। তথি পূরিত সুধারস॥
কস্তূরী-তিলক ললাটে। সুগুঞ্জামাল কণ্ঠতটে॥
হেমকঙ্কণ বেনি ভুজে। রবিকিরণ-দর্প গঞ্জে॥
মুদ্রিকা শোহই অঙ্গুলি। ঝটকে নানা রত্নে ঝলি॥
পীতবসন কটিমাঝে। ঘনে কি দামিনী বিরাজে॥
তথিরে সুবর্ণমেখলি। হেম-ঘর্ঘরী নাদ বলি॥
চরণে নূপুর বিরাজে। চালন্তে রুণঝুনু বাজে॥
শ্রীহস্তে লউড়ি শোভন। যেসনে পালক গোধন॥
মস্তকপরে শিখা-চূল। তথি বেষ্টিত জামুডাল॥
শ্রবণযুগলে কুণ্ডল। নৃত্য করই গণ্ডস্থল॥
নাসাপুটরে মোতি-শোভা। অধরামৃত-পানে লোভা॥
হোই অচ্ছন্তি তেজোবন্ত। কহি নুহই অলোকিত॥"

মূর্ত্তি ত নয়, সে যেন নব নীল জলধর। কিবা ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় কমনীয় কান্তি। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন। প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় নয়ন। পক্ক-বিম্বের মত সুরঙ্গ অধর। পক্ষিচঞ্চুর ন্যায় মনোহর নাসিকা। মুখে মন্দমন্দ হাস্য। সে যেন সুধার রসে পরিপূর্ণ। ললাটে কস্তূরী-তিলক। কণ্ঠে গুঞ্জার মালা। উভয় করে রবিকিরণগঞ্জন কনক-কঙ্কণ। অঙ্গুলিতে নানা রত্ন-খচিত অঙ্গুরীয়ক। পরিধানে পীতবাস। আহা, সে যেন নবঘনে দামিনীবিকাশ। কটিতটে সুবর্ণ-মেখলা, তাহাতে বাজন্ত-ঘুঙ্গুর

শব্দায়মান। চরণে নূপুর বিরাজিত; চলিবার কালে রুণুঝুনু করিয়া বাজিতেছে। শ্রীহস্তে সুন্দর লগুড়; যেন পাঁচনবাড়ি-হস্তে গোধনপালকই চলিয়াছে। মস্তকে ঝুঁটি-বাঁধা চূল, তাহার চারিদিকে জামডাল বাঁধা। যুগল কর্ণে কুণ্ডল, গণ্ডস্থলে দলমল করিয়া তুলিতেছে। নাসার অগ্রে মুকুতার নোলক, সে যেন অধরামৃত-পানের লোভেই অতীব চঞ্চল। তাঁহার সে শান্ত শীতল সমুজ্জ্বল তেজ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এমন রূপ বুঝি কেহ কখন দেখে নাই।

দামোদর এইরূপ দিব্য রূপ ধরিয়া স্কন্ধে ভার বহিয়া চলিয়াছেন। ভারের উভয় দিকে নানাপ্রকার দ্রব্য স্তরেস্তরে সজ্জিত। সরু চাউল, মুগের বিউলি, ঘৃত, নবাত, দুগ্ধ, দধি, হরিদ্রা, সরিষা, আদা, তিন্তিড়ী, হিং, মরীচ, ফুলবড়ি প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তাহাতে সংরক্ষিত। তাহার উপর ধনরত্ন বসনভূষণও আছে। ভাবগ্রাহী ভগবান্ এইরূপ ভার বহিয়া যাইতে-যাইতে গীতা-পণ্ডার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই জলদ-গম্ভীরস্বরে ধীরেধীরে ডাকিতে লাগিলেন,—কে আছেন গা; গীতা-পণ্ডার ঘরে কে আছেন গা? শীঘ্র আমার নিকটে আসুন, আপনাদের খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাউন।

ভগবদ্‌ভাবে বিভোর ব্রাহ্মণ এ কথা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার পত্নী ক্ষুধায় ও দুশ্চিন্তায় জাগিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি ডাক শুনিবা মাত্রই বাহিরে ধাইয়া আসিলেন এবং কবাট খুলিয়া সেই দিব্য গোপালমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সে যেন কি দেখিতেছেন!

তাঁহার চর্ম্মচক্ষুতে আর পলক পড়িল না। তিনি বিস্ময়ে-বিস্ময়ে গোপবালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ বাপু, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আহা! তোমার স্কন্ধে বিপুল ভার দেখিতেছি, এ ভার শীঘ্র নামাইয়া রাখ, নামাইয়া রাখ। এ ভারে আছেই বা কি? প্রকাশ করিয়া বল।

জগন্নাথ বলিলেন,—আমি ত বিশেষ কথা কিছু জানি না। গীতা-পণ্ডার একজন মিত্র আমাকে ডাকিয়া কি কি সামগ্রী যোগাড়যন্ত্র করিয়া এই ভারে সাজাইয়া দিয়া আমাকে বলিলেন,— "বাপু, তুমি এগুলি গীতা-পণ্ডার বাটীতে দিয়া আইস। যার-তার হস্তে ত দিতে বিশ্বাস হয় না, সে যদি কম-সম করিয়া ফেলে।" আমি তাঁহার বড় বিশ্বাসের পাত্র। একদণ্ডও তাঁহার কাছ ছাড়া থাকি না। তাঁহার আজ্ঞা মান্য করিয়া থাকি। যেখানে পাঠান, সেইখানেই যাই। তাই তাঁহার আজ্ঞা প্রমাণে এই দ্রব্যগুলি দিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আপনি এগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিন,—আমার প্রতি দয়া রাখিবেন। আর গীতা-পণ্ডাকে বলিবেন, তিনি যেন আমায় মনে রাখেন।

ভগবানের ভুবনভুলানো কথায় পণ্ডা-পত্নী ভুলিয়া গেলেন। কি উত্তর দেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি যে দয়ার সাগর জগদীশ্বর, তাহা চিনিতেও পারিলেন না। মনে করিলেন,—এ বুঝি আমাদের মত মানবই হইবে। ক্ষণপরে বলিলেন,—বাপু হে, তুমি ভারটি স্কন্ধ হইতে নামাইয়া রাখ, আহা তোমার অল্প বয়স, কোমল অঙ্গ, স্কন্ধে না জানি কতই

ব্যথা লাগিতেছে। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ একটুকু মুচকি হাসিয়া স্কন্ধ হইতে ভারটি নামাইলেন এবং তাহা হইতে সামগ্রীগুলি সারিসারি সাজাইয়া নামাইতে থাকিলেন। সকল সামগ্রী নামান হইয়া গেল। চক্রপাণি হাসিতে-হাসিতে পণ্ডা-ঘরণীকে কহিলেন,—আপনি এইগুলি গৃহ মধ্যে লইয়া যান। ব্রাহ্মণীও ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলি গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে তাঁহার ঘরদ্বার ভরিয়া গেল,—আর রাখিবার স্থান নাই। ভাবিলেন,—এ-ত বড় চমৎকার কথা,—এই সামান্য এক-ভার সামগ্রী, ইহাতেই ঘরদ্বার সমস্ত পূর্ণ হইয়া গেল! ঘরে আর রাখিবার একটুও স্থান নাই! অহো, এ ভারবাহকের জীবন ধন্য। সে এত সামগ্রী একভারে করিয়া আনিল কি প্রকারে? তিনি বিস্ময়ে-বিস্ময়ে বাহিরে আসিয়া ভারবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ বাপু,—তোমার জাতি-গোত্র কি? ছেলে মানুষ দেখিতেছি। তুমি একা একভারে এত দ্রব্য বহিয়া আনিলে কি প্রকারে? শুনিয়া সহাস্যবদনে শ্রীহরি বলিলেন,—ওগো বিপ্র-রমণি, আমার পরিচয়টা দিই শুনুন।—

"আম্ভে গোপাল-পুত্র সিনা। ব্রজরাজঙ্ক সান জেনা॥
ঘরে মুঁ ন রহই ক্ষণে। নিত্যে বুলই এণে তেণে॥
বিশ্বাস-ভাব দেখেঁ যার। ভার মুঁ বহই তাহার॥
তাকু ন চ্ছাড়ে মোর মন। নিরতে থাএ সন্নিধান॥
সে মোতে পত্র পুষ্প দেলে। তাহা মুঁ মনে মেরু তুলে॥
অধিক কি কহিবি তোতে। নির্ম্মল ভাব লোড়া মোতে॥"

আমি হইতেছি গোয়ালার ছেলে। ব্রজরাজের কনিষ্ঠ কুমার।

আমি এক মুহূর্ত্তও ঘরে থাকিতে পারি না। নিত্যই এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াই। যাহার বিশ্বাস-ভাব নজরে পড়ে, তাহার ভার বিনা-বেতনে বহন করিয়া থাকি। আমার মন তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না। তাহার কাছে নিয়তই পড়িয়া থাকে। সে যদি আমাকে সামান্য পত্রপুষ্পও প্রদান করে, আমি তাহাকে সুবর্ণশৃঙ্গ সুমেরুর মতই মনে করিয়া থাকি। আপনাকে আর অধিক কি বলিব, নির্ম্মল ভাব দেখিলেই আমি ভুলিয়া যাই। তাহাই আমার একমাত্র লোভের সামগ্রী। এখন আপনি এক কার্য্য করুন, এই সকল সামগ্রী সাবধানে রাখিয়া দিন, আর আমাকে দয়া করিয়া বিদায় দিন, আমি এখন আসি।

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—হাঁ বাছা, সেকি হয়। এত বড় একটী জমকাল ভার বহিয়া তুমি আমার বাটী আনিলে, আর আমি তোমায় কিছু খাইতে না দিয়া বিদায় দিব? একি একটা কাজের কথা? তুমি বাপু, এক দণ্ডকাল অপেক্ষা কর, আমি রন্ধন করিয়া তোমাকে অন্ন ভোজন করাইতেছি। তাহার পর তুমি চলিয়া যাইও। তাহাতে কিছু আপত্তি করিব না। অমনি-অমনি চলিয়া গেলে পাঁচজন লোকেই বা বলিবে কি, আর পণ্ডাই বা নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমাকে বলিবেন কি? এ কথা শুনিয়া শ্রীহরি বলিলেন,—ওগো পণ্ডাউনি, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, তবে কিনা আমার থাকা যে আমার আয়ত্ত নয়। আমার যে নানা জঞ্জাল। পণ্ডা উঠিলে আমার

কথা তাঁহাকে বলিলেই তিনি সব বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার অন্ন খাইতে ত কোন আপত্তি নাই, প্রাণ সদা খাইতেও চায়, কিন্তু হইয়াছে কি, আমার জিহ্বায় বড় ক্ষত হইয়াছে। এই দেখুন, তিন-ধারে রুধির বহিতেছে। তাহার জ্বালায় আমি বড় অস্থির হইয়াছি! তাই আমি ভোজন করিতে পারিলাম না। পণ্ডাকে এই কথা বুঝাইয়া বলিবেন। আমি চলিলাম।

এই কথা বলিয়া জগন্নাথ ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন। পণ্ডা-পত্নীও তাড়াতাড়ি রাঁধা-বাড়া সারিয়া আনন্দমনে যাইয়া পতির আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গাইতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কোপ আর নাই। তিনি প্রীতিপূর্ণ কোমল আহ্বানে বলিতে লাগিলেন,—প্রাণনাথ, তোমার কথা সত্য গো সত্য। তুমি তৎপর উঠিয়া ব্যাপারখানা একবার দর্শন কর। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অমনি উঠিয়া পড়িলেন। খিল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখেন,—অহো, ধন-রত্নে বসনে-ভূষণে বিবিধ ভোজ্য-সামগ্রীতে গৃহদ্বার ভরিয়া গিয়াছে! তিনি মহা বিস্ময় সহকারে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, বল সুন্দরি! ব্যাপারখানা কি? পত্নী আদ্যোপান্ত সকল কথাই—সেই গোপকুমারের রূপ, বেশ, সুমিষ্ট সম্ভাষণ প্রভৃতি সকল কথাই পতির নিকটে বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় হর্ষ-বিষাদে ভরিয়া গেল। তাঁহার তখন এক ভাবই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি দু'বাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। মনেমনে বলেন,—হা হা, প্রভু বিশ্বম্ভর! এ লীলা তোমারই প্রভু তোমার। হায় হায়, তোমার

এত করুণা আমরা দেখিয়াও দেখি না। তোমার দীনবন্ধু নামের কাঙ্গালের ঠাকুর নামের নিষ্কিঞ্চননাথ নামের জয় হউক নাথ! জয় হউক।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া রহিলেন। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পত্নীকে বলিলেন,—সতি! তোমার মত সৌভাগ্যবতী আর নাই; তুমি চর্ম্মচক্ষে সেই শুক-সনকাদির ধ্যানের ধনকে দর্শন করিয়াছ; আজ আমি তোমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার সৌভাগ্যেরও আর সীমা নাই। কিন্তু একটি কথায় যে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। এ হৃদয়বিদারক দুঃখের কারণও তুমিই। আহা, তুমি আমার প্রভুকে ক্লেশ দিয়াছ; তুমিই তাঁহার জিহ্বায় ক্ষত জন্মাইয়া দিয়াছ। হায় হায়, গীতা কি সামান্য তালপাতার পুঁথি? এ যে সাক্ষাৎ গোবিন্দগীতি—সাক্ষাৎ গোবিন্দের মূর্ত্তি। তুমি সেই গীতার অঙ্গে লৌহলেখনীর তিনটী আঘাত করিয়াছিলে, তাই প্রভুর আমার জিহ্বায় তিন-ধারে রুধির ঝরিয়া পড়িতেছে। হায়, না জানি প্রভুর কতই না বেদনা হইতেছে? চল চল সুন্দরি! আমরা শ্রীপ্রভুর দেউলে গমন করি এবং আর্ত্তস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করি; নচেৎ আর আমাদের নিস্তার নাই।

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া পত্নী সমভিব্যাহারে সত্বর নীলাচলনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। উভয়ে মহা অপরাধীর মত কাঁদিতে-কাঁদিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। উঠিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া দেখেন,—হায় হায়, তাঁহার সুরঙ্গ অধরে তিন-ধারে রুধির

বহিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া তো তাঁহারা আর নাই। শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণ উদ্দেশে সেইখানেই দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক ক্ষমা প্রর্থনা করিতে থাকিলেন। ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলি করযুগল মস্তকে রাখিয়া ভক্তি-গদ্গদ-কণ্ঠে কেবলই বলেন,—হে প্রভু! হে মহামহিমার্ণব! তোমার মহিমা ছার মানব আমরা কি বুঝিব বল? তাই অপরাধ পদেপদেই করিয়া থাকি। কিন্তু বলিহারি প্রভু! তোমার শরণাগত-বাৎসল্য! তুমি শরণাগতের ভার আপনার স্কন্ধেই বহিয়া থাক বটে! মহিমময়! তোমার মহিমা অপেক্ষা কি অজ্ঞ মানবের মোহমহিমা আরও অধিক? সে কেমন করিয়া এমন দয়াময় ঠাকুরকেও ভুলিয়া থাকে? হায় প্রভু!—

"এমন্ত প্রভু-সেবা চ্ছাড়ি। যে অন্য মার্গে যাএ বঢ়ি॥
ধিকহুঁ ধিক সেহু নর। সে কাহিঁ ভবুঁ হেব পার॥"

তোমার মত ঠাকুরের সেবা ছাড়িয়া যে অন্য মার্গে প্রধাবিত হয়, সে মানবের জীবনে ধিক্,—ধিক্ ধিক্ শতেক ধিক্। হায়, সে এই সুদুস্তর ভবসাগরের পারে যাইবে কি প্রকারে? করুণাময়! আমার পত্নী অবলা স্ত্রীজাতি। সে তো কিছু জানে না—মহামূর্খা; তাই তোমার চরণে মহা অপরাধ করিয়া বসিয়াছে; তাহার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর নাথ! ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করিলে আর আমাদের নরক-নিস্তারের উপায় নাই যে ঠাকুর! আর আমরা কার কাছেই বা গিয়া দাঁড়াইব প্রভু! এ ব্রহ্মাণ্ডে যে তুমি ভিন্ন আর আমাদের কেহই নাই। দয়াময়! আমাদের

অপরাধ ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমার নাম গান করিয়া দিন যাপন করিতে পারি।

প্রীতিভরে এইরূপ প্রার্থনা করিতে-করিতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন,—শ্রীপ্রভুর সেই রুধির-ধারা অদৃশ্য হইয়া গেল ;—তাঁহার পঙ্কজ-বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; তিনি যেন কর-সঙ্কেতে তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া পত্নীসহ প্রসন্নমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, বালক-বালিকাবৃন্দ জঠরজ্বালায় ক্রন্দন করিতেছে ; তাহাদের লইয়া সকলে একত্র ভোজন করিলেন। কৃপাময়ের কৃপায় আর তাঁহাদের কিছুই অভাব নাই। আনন্দে-আনন্দেই তাঁহারা এখানকার খেলা শেষ করিয়া সেই লীলাময়ের খাস খেলার রাজ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন।

শান্তোবা।

(১)

মোগল সম্রাটগণের শাসনকালে, দক্ষিণদেশে—"রঞ্জনম্" নামক পল্লীগ্রামে, শান্তোবা নামে জনৈক ধনবান ব্যক্তি বাস করিতেন। সংসারের সুখসমৃদ্ধি তাঁহার ষোল আনার উপর সতের আনা ছিল। দেশে সম্মান মর্য্যাদাও যথেষ্ট। অভাব কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। দুনিয়ার মজা যেমন লুটিতে হয়, তাহা তিনি পূরা মাত্রায় লুটিতেন,—তাহাতেই সতত বিভোর হইয়া রহিতেন। এখানকার আনন্দ যে আনন্দই নয়,—আনন্দের কায়া নয়—ছায়ামাত্র, এ কথা একবারও তাঁহার মনে হইত না।

মহামায়ার বিচিত্রতাময়ী ভূয়াবাজীতে যাহাদিগের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে, তাহাদিগের সেই ধাঁধা ছুটাইতে পারেন—একমাত্র ভাগবত-জনের করুণা, অথবা তাঁহাদের করুণাপ্রসূত অমৃতোপম উপদেশ-বাণী। একদিন কথায় কথায় পরম ভাগবত তুকারামের ভক্তিভরা উপদেশ-কথা শান্তোবার শ্রবণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ভক্তচূড়ামণির সেই মহাশক্তিশালিনী কথা তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে যাইয়া পশিল। সে কি-এক আনন্দে—কি-এক সুখে যেন তাঁহার ভিতরটা ভরিয়া গেল। একখানা যাদুমন্ত্রমাখা রংচঙে পরদা দিয়া কে যেন তাঁহার নয়ন ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, এইবার তাহা সর্‌সর্

সরিয়া গেল। তিনি যেন নূতন নয়ন পাইলেন। এ নয়ন তাঁহাকে যাহা দেখাইল—তাহাও নূতন ; সুধু নূতন নয়, মনেরও মতন। এই নয়নই তাঁহার নবজীবনেরও আরম্ভ করিয়া দিল।

আজ শান্তোবা যাহা দেখেন, পূর্ব্বের সহিত তাহার কিছুই সামঞ্জস্য নাই,—বরং বিপরীত। পূর্ব্বে যাহা অমৃতের মত বোধ হইত, আজ তাহা বিষবৎ। পূর্ব্বে যাহা 'আমি আমার' বলিয়া ভুলাইত, আজ তাহার এমন বিকট মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা আসক্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তিরই উদ্রেক করে। আজ তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যেন স্বতন্ত্র রাগ-রাগিণীর আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার ঝঙ্কার যেন মেঘমল্লারের মত শান্তোবার অহঙ্কারের দীপক-রাগ শান্ত শীতল করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার মাধুর্য্য যেন চির-নবীনতায় মাখানো। মনে হইলেই কেমন যেন চক্ষু বুজিয়া-বুজিয়া আসে।

শান্তোবা আজ নূতন মানুষ। তাঁহার চিন্তাও নূতন। এতদিন চিন্তা ছিল কেবল ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি-সাধনের কিংবা কামিনী-কাঞ্চনের, আজ তাহার গতি বিপরীত পথে চলিয়াছে। এখন চিন্তা,—তাই তো, তুচ্ছ সুখে মানবজীবনের এতটা অমূল্য সময় অতিবাহিত করিলাম ? হায়, আমার গতি কি হইবে ? কি করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম পাইব ? আর তো দিন নাই, গোণা দিন বই তো নয় ? ফুরাইলেই হইল। তা-ও তো নিশ্চয় নাই,—কবে বা কখন যাইতে হইবে ? অথচ একদিন এখান ছাড়িয়া যে যাইতে হইবে, ইহা তো ঠিক ? ঐ যে যমও তো দণ্ড-হস্তে সময়ের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়-

মান। তবে উপায়? কে আছ, কোথায় আছ, ব'লে দাও,—আমায় দয়া ক'রে ব'লে দাও, এখন আমি কি করি?

এইরূপ আকুলপ্রাণে ভাবিতে-ভাবিতে শান্তোবা চিন্তার কূল পাইলেন। অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় তিনি তাঁহার আসক্তির সকল সামগ্রী,—জননী, পরিণীতা পত্নী, বিষয়-বৈভব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলেন। বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে এবং ভৃত্যবর্গকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে-করিতে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। আপনার বলিবার সঙ্গে রহিল কেবল একমাত্র কৌপীন। লোকলজ্জার অপেক্ষা না থাকিলে বোধ হয় তাহাও তাঁহাকে লইতে হইত না। তিনি নয়ন-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে-চলিতে ভীমরথীনদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদী দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল না। হইবেই বা কেন? অপার সংসার-সাগর পার হইয়া যিনি অনন্তের পথে চলিয়াছেন, সামান্য নদী দেখিয়া তাঁহার অন্তর কি কখনও ভীতি-কম্পিত হইতে পারে? শান্তোবা সন্তরণ করিয়া নদীর পরপারে গমন করিলেন। দেখিলেন,—সম্মুখেই পর্ব্বত। তাহাতেও তাঁহার গতি ব্যাহত হইল না। তিনি বৃক্ষবল্লরী ধরিয়া—শিকড়-পাথর ধরিয়া সেই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলেন। সেখানকার শান্তিময় শোভায় তাঁহার মনঃ-প্রাণ ভুলিয়া গেল। কেবলই ভাবেন,—আহা হাহা, কি প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ নিভৃত স্থান! হায়, লোকালয়ে এ পবিত্র সৌন্দর্য্য—এ মাধুর্য্যভরা নিস্তব্ধতা কোথায়? আহা হাহা, অজস্র কণ্ঠভেদী চীৎকারেও সংসারে যাঁহার সাড়া পাওয়া যায় না, এখানে যেন এক-

ডাকে—কিংবা ডাক দিতে-না-দিতে তাঁহার দেখা পাওয়া যায়। আহা হাহা, ঝরণার জল—বিহঙ্গের দল কাহার কাছে গলা সাধিয়া এমন রাগিণী শিখিল রে? এ রাগিণীর নামই বা কি? আহা হাহা, কাণও জুড়াইয়া গেল, প্রাণও পরিতৃপ্ত হইল। আমি আর এ স্থান ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইব না; এই পর্ব্বতের গুহায় থাকিয়া সেই সর্ব্বগুহাবিহারী শ্রীহরিকে আরাধনা করিব।

তাহাই হইল। শান্তোবা পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর মত—কমলকোষমুক্ত মধুকরের মত সেই মুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তপ্রাণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণে আনন্দ কত! পাখী ডাকে, তিনিও হরি-হরি ধ্বনি করিয়া উঠেন। পেখম ধরিয়া ময়ূর নাচে, তিনিও দু'বাহু তুলিয়া নাচিতে থাকেন। নির্ঝরিণী গান ধরে, তিনিও মধুর-মধুর বঁধুর গানে বিভোর হইয়া পড়েন। পশু নাই, পক্ষী নাই, সে গান যে শুনে, সে-ই ভুলে,—সে-ই কি-এক অব্যক্ত অস্ফুট স্বরে সেই গীতিকে তুমুল করিয়া তুলে। তাহার মাধুর্য্য যেন তাহাতে আরও অধিক বাড়িয়া যায়,—সুধাস্রাবী সঙ্গীত-লহরীতে সমগ্র বনভূমিই যেন ছাইয়া যায়। এই গানের গুণে বা টানে হিংস্রক অহিংস্রক সকল জীব-জন্তুই শান্তোবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তরু লতা তৃণ-গুল্ম—তারাও বুঝি তাঁহার প্রেমে ডগমগ। নইলে অত ফুল অত ফল তো তাদের কোন কালে ছিল না? ওষধিরাও তো অত সুবাস আর কখনও ছড়াইত না? বনভূমিরও তো অত সুষমা অন্য কোনদিন দেখা যাইত না? শান্তোবার আজ শান্তির সংসার।

(২)

এ সংসারে একের ভাল কখনও সকলের ভাল হয় না। একের মন্দও কখনও সকলের মন্দ হয় না। একের যাহা ভাল অপরের হয় ত তাহাই মন্দ। আবার একের যাহা মন্দ অপরের হয় ত তাহাই ভাল। ইহাই যে এ রাজ্যের নিয়ম। তাই শান্তোবার এত শান্তি তাঁহার মাতা ও বনিতার অশান্তিরই কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা কি উপায়ে শান্তোবার এই শান্তিময় সংসার ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে আপন অধিকারে আনয়ন করিবেন, কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে-ভাবিতে মাতার মাথায় মতলব আসিল। তিনি পুত্রবধুকে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় বিভূষিত করিয়া পুত্রের সমীপে প্রেরণ করিলেন। ভাবিলেন,—এই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী পুত্র-বধূর রূপের ফাঁদেই পুত্রকে পাকড়াইয়া আনিবেন। হায় রে অপত্য-স্নেহ! পুত্রবিরহবিধুরা বৃদ্ধা জননী একবারও ভাবিলেন না যে, এই ফাঁদ কাটিয়াই যে তাঁহার পুত্র পলাইয়া গিয়াছে!

শ্বশ্রূর অনুমতি পাইয়া পতিব্রতা শান্তোবা-পত্নী লোকজন-সঙ্গে পতি ধরিতে চলিলেন। তাঁহার আজ আনন্দ দেখে কে? কেবলই ভাবেন,—আনিতে পারি আর না-ই পারি, এক-বার ত তাঁহার চরণ দর্শন পাইব। আমায় ছাড়িয়া যদি তিনি সুখে থাকেন, তাহাই আমার পরম সুখ। সে সুখে আমি বাধা দিতে চাহি না। একবার ত দেখা পাইব, তাহাই আমার পরম লাভ। এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে তিনি বহু কষ্টে সেই

দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পতিদেবতার পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। লজ্জাবতী লতার মত অবনত মস্তকে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কত কথা বলিব-বলিব মনে করিলেন, কিন্তু বাষ্প-বেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে পারিলেন না।

অপরূপ রূপের ডালি লইয়া প্রিয়তমা পত্নী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখিয়া শান্তোবার অণুমাত্র চিত্তক্ষোভ হইল না। তিনি অচল অটল ভাবে বসিয়া রহিলেন। এই ভাবেই কিছু-ক্ষণ কাটিয়া গেল। কাহারও মুখে কথাটী নাই। সতী কত কি ভাবিতে-ভাবিতে পূর্ব্বের কথা—শ্বশ্রূর অনুমতির কথা, সকলই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ফলে, ধরিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরা পড়িয়াই যাইতে হইল। তিনি ধীরেধীরে পতির চরণতলে প্রণত হইয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে দুইটী চরণ ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—দেব, আপনি আপনার ভগবানের আরাধনা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। কিন্তু প্রভু, আমার যে আর অন্য ভগবান্ কেহ নাই। আপনিই যে আমার প্রত্যক্ষ ভগবান্। তাই দাসী আজ আপনার চরণ সেবা করিতে আসিয়াছে, সেবিকাকে আশ্রয় দিয়া সেবা অঙ্গীকার করিবেন না কি?

অবলা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে পতি-পদতলে পড়িয়া রহিলেন। এইবার শান্তোবার মুখে কথা ফুটিল। কামের প্রেরণায় নয়, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি

আন্তরিক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—বেশ, তুমি আমার নিকটে থাকিতে পার, কিন্তু আমার মত হইয়া থাকিতে হইবে। যদি তুমি তোমার অঙ্গের এই বহুমূল্য আভরণ ও বস্ত্রগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমারই মত সামান্য বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পার, তবেই এখানে থাকিতে পাইবে; নচেৎ যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। সতী পতির কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং সুশোভন বসন ভূষণ দূর করিয়া দিয়া সামান্য তাপসীর বেশে তপস্বী স্বামীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। আজ এই কঠোর পার্ব্বত্য ভূমিতে পতি-ব্রতার প্রাণে যে বিমল আনন্দ, এ আনন্দ তিনি বিলাস বৈভবপূর্ণ সুকোমল আস্তরণ-সমাকীর্ণ সুরম্য প্রকোষ্ঠেও একটি দিন অনুভব করেন নাই।

(৩)

এইরূপ আনন্দেই পতি-পত্নীর দিন কাটিয়া যায়। একদিন শান্তোবার ইচ্ছা হইল, পত্নীর অবস্থা কতটা উন্নত হইয়াছে, সংযম-সাধনে তাঁহার কতটা দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। অন্যদিন বন্য ফল-মূলে ও ঝরণার জলে তিনি ক্ষুধা-পিপাসা শান্ত করিয়া থাকেন, সেদিন পত্নীর কাছে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন,—অনেকদিন রুটী-টুটী খাওয়া যায় নাই, গ্রাম হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারিলে মন্দ হইত না। স্বামীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে

পতিব্রতা বলিয়া উঠিলেন,—আদেশ পাইলে আমিই যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি। শান্তোবা বলিলেন,—ভাল, তুমি ভিক্ষার জন্য যাইতে পার, কিন্তু দেখো যেন আধখানার অতিরিক্ত রুটী কাহারও কাছে ভিক্ষা লইও না। আপনার যাহা অনুমতি, বলিয়া সতী ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা, অন্তঃপুরের অবরোধে চির অবরুদ্ধা পতিব্রতা ভিক্ষা কাহাকে বলে জানেন না। কিন্তু কি করেন, পতি-দেবতার প্রীতি-উদ্দেশে আজ তিনি সেই কণ্টক-কঙ্কর-সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে আভরণ নাই, পরিধানে বহুমূল্য বস্ত্র নাই, কেশের সংস্কারও নাই। ছিন্ন গৈরিক বসনে ও রুক্ষ কেশে আজ তাঁহার কতই না শোভা! যে দেখে সে-ই মনে করে, বনদেবী যেন বনভূমি ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে গমন করিতেছেন। পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের দীপ্ত রাগে রমণী এমনই রমণীয় দেখায় বটে!

গ্রামের মধ্যে গমন করিয়া সাধ্বী দ্বারেদ্বারে রুটী ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বেড়াইতে-বেড়াইতে তিনি তাঁহার ননদিনীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। ভ্রাতৃজায়ার ভিখারিণীর বেশ-দর্শনে তিনি ত কাঁদিয়াই আকুল। অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হাঁ ভাই, এ দশা তোদের কত দিন? দাদার কি আমার বিষয়-বৈভব সমস্তই নষ্ট হইয়াছে? ননদিনীর কথার উত্তরে সতী পতির বিরক্তি ও গৃহত্যাগাদি—একেএকে

সকল কথাই সংক্ষেপে বলিলেন এবং ক্ষুধার্ত্ত স্বামীকে ফেলিয়া আসিয়াছি, অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না, অর্দ্ধ খণ্ড রুটী ভিক্ষা দিতে হয় দান কর, নচেৎ আমি চলিয়া যাই,—বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। না না, একটু ব'স ভাই, একটু ব'স, বলিয়া ননদিনী প্রচুর পরিমাণে ঘৃতপক্ক লুচি, পুরি প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য চাঙ্গারি ভরিয়া আনিয়া দিলেন। ভ্রাতৃবধূও তাহা লইবেন না, ননদিনীও ছাড়িবেন না। এইরূপে অনেকক্ষণ ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চলিল। ক্ষুধার্ত্ত পতির কথা পতিব্রতার মনে পড়িয়া গেল। তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ননদিনীকে 'তবে ভাই! আমি আসি'—বলিয়া, খাবারের চাঙ্গারি লইয়া, চঞ্চলপদে চলিয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি যাইলে কি হইবে? সে পথ তো আর সোজা নয়; সেই দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিতে তাঁহাকে অশেষবিধ ক্লেশ পাইতে হইল। তিনি বার-বার পদস্খলন পতন ও পদতলে কণ্টকাদির বিন্ধন সহন করিয়া, যতদূর সম্ভব শীঘ্রগতি পতিদেবতার নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে চাঙ্গারিখানি রাখিয়া দিয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

শান্তোবা প্রশান্ত-নয়নে সেই চাঙ্গারির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার নয়নের প্রশান্তভাব প্রশমিত হইয়া গেল। তিনি কোপ-কষায়-নেত্রে অবলার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটী সহকারে কহিলেন,—এই ইন্দ্রিয়-তর্পণ ভোজনের আয়োজন তোমাকে কে আনিতে বলিয়াছিল? আনিতে বলিলাম,—রুটীর টুক্‌রা, আনিলে কিনা

লুচির চাঙ্গরা? যাও, এখনই এখান থেকে এ সকল খাদ্য লইয়া যাও,—যাহার জিনিষ তাহাকে ঘুরাইয়া দিবে যাও; আর যদি আনিতে পার তো বাড়ী-বাড়ী সাধিয়া রুটীর টুক্‌রা লইয়া আইস। পতিব্রতা পতির কাছে যথা-কথা খুলিয়া বলিলেন, তাঁহার ভগিনীর একান্ত অনুরোধে—অনিচ্ছা-সত্ত্বেই যে তাঁহাকে এই সকল আনিতে হইয়াছে, তাহাও কহিলেন; কিন্তু শান্তোবা তাহা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না, পূর্ব্বকৃত আদেশের এক বর্ণও প্রত্যাহার করিলেন না।

(৪)

দেবতায় যাঁহার ভক্তি আছে, দেবতার প্রীতির জন্য তিনি না পারেন কি? পর্ব্বতে চড়াই ও ওৎরাইয়ে ওঠা-নামা করিয়া, পথে নানা যাতনা সহিয়া, সতীর শরীর থরথর কাঁপিতেছিল, নাসিকায় ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, কিন্তু পতিদেবতার অনুমতি পাইবামাত্র তিনি আর মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়া সেই চাঙ্গারিখানি লইয়া আবার গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনিও যে তাঁহার দেবতা পতির প্রতি ভক্তিমতী,—কায়মনো-বাক্যে তাঁহারই প্রীতির প্রার্থী।

স্বামি-সোহাগিনী গ্রামে আগমন করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতি-পালন করিলেন;—সুমিষ্ট সম্ভাষণে ননদিনীকে খাবারের চাঙ্গারি ফিরাইয়া দিয়া এবং কয়েক বাড়ী হইতে কয়েক খণ্ড রুটী ভিক্ষা করিয়া পর্ব্বতের দিকে চরণ চালাইলেন। কিন্তু, অহো কি দৈব-দুর্ব্বিপাক, কিছুদূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি

আসিল। সে মেঘেরই বা হাঁকুনি-ডাকুনি দেখে কে? পথ চলা ভার। পতিব্রতা অতিকষ্টে গুটিগুটি পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি অঙ্গবস্ত্র দিয়া রুটীর টুক্‌রা কয়টি ঢাকিয়াছেন। সে রুটী যে তখন তাঁহার কাছে আপন অঙ্গের অপেক্ষাও বহুমূল্য! তাহাতেই যে তাঁহার দেবতার প্রীতি-সম্ভাবনা। তিনি শীত-কম্পিত শরীরে ধীর-পদ-বিক্ষেপে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, নদীতীরে আসিয়া তাঁহার বল-ভরসা সকলই উড়িয়া গেল। পার্ব্বত্য নদী প্রবল জলে উছলিয়া পড়িয়াছে। পার করিবার তরী নাই—কাণ্ডারী নাই। রমণীর চিন্তার নদীও ভীম-রথীর সেই ভীমা মূর্ত্তির অপেক্ষাও মহা ভীমা মূর্ত্তি ধারণ করিল। বাহিরে ভীমরথী-নদীর উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ, অন্তরে চিন্তা-তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-সংঘাত; অবলা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কোথায়, কে আছ; একাকিনী অসহায়া রমণী, আমাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার কর, ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিনি কাতরে চীৎকার-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হায় হায়,—কই, কেহই তো আসিল না। ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল; ভাবিলেন, —হায়, ঐ যে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল, তবে,—তবে কি হবে; আমার অভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত স্বামী—তাঁহার খাদ্য কে তাঁহাকে পঁহুছাইয়া দিবে? হায়, পাণ্ডব-সখা পাণ্ডুরঙ্গ দেব! তুমি একবার করুণা-অপাঙ্গে চাহিয়া দেখ;—কই, কোথায়—কোথায় তুমি?

পতিপ্রাণা প্রাণের প্রাণ পাণ্ডুরঙ্গকে ডাকিতে-ডাকিতে তাঁহার টনক নড়িল; ভক্ত-রক্ষার নিমিত্ত তিনি মহা ব্যস্ত

হইয়া পড়িলেন; সেবকবৃন্দের অসামান্য সেবা-সমাদর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য নাবিকের বেশে সেই জল-কর্দ্দম-দুর্গম পিচ্ছিল পথে—সতীর সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জলদ-নাদে জিজ্ঞাসিলেন,—হাঁগা বাছা! এ দুর্য্যোগে তুমি একাকিনী বাটীর বাহির হইয়াছ কেন? আহা, ভিজিয়া ভিজিয়া তোমার শরীর যে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে! এত কষ্ট সহিয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?

পতিপ্রাণার আর মুখ ফুটিয়া কথা বাহির হইতেছিল না; তিনি নয়ন মুদিয়া সেই ভবপারের কাণ্ডারীকে ভাবিতেছিলেন। এই কর্ণরসায়ণ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তিনি ধীরেধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন,—দেখিলেন—জনৈক প্রবীণ নৌকাবাহক। তিনি অনেকটা আশ্বস্তের ভাবে—আস্তে-আস্তে সমস্ত অবস্থা তাহাকে জানাইলেন। শেষ করুণা ভিক্ষা করিয়া বলিলেন,—দেখ বাপু! ভগবান্ পাণ্ডুরঙ্গই তোমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তুমি দয়া না করিলে আমার আর পারে যাইবার উপায় নাই। তুমি পিতার মত বা অগ্রজের মত আমাকে একটু স্নেহ পূত দৃষ্টিতে না দেখিলে চলিতেছে না। যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে নদী পার করিয়া দিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের অধিকারী হও। আহা, অভুক্ত পতি যে আমার ঐ নদীপারে পর্ব্বতের উপরে। আমি না যাইলে যে তাঁহার আহার হইবে না।

এইরূপ বলিতে-বলিতে রমণীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। যেন ঢলিয়া পড়েন পড়েন।

আহা, ভামিনীর ভাব দেখিয়া ঐ যে মায়ানাবিকেরও নয়ন-প্রান্তে করুণার রেখা দেখা দিয়াছে। নাবিক আর থাকিতে পারিল না ;—স্নেহ-পালিতা কন্যার মত তাঁহাকে কোলে করিয়া পৃষ্ঠের উপর চাপাইয়া লইল এবং সন্তরণ-সাহায্যে নদী পার হইয়া—পতিরতার পতির তাপস-বাসে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে-দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। দুইটা কৃতজ্ঞতার ভাষা শুনিবারও অপেক্ষা করিল না।

কামিনীর কিন্তু এ সকলের খেয়ালই নাই, তিনি করিয়াছেন কি ?—তিনি তাঁহার লজ্জাবস্ত্রখানি সমস্তই সেই রুটীর টুক্‌রার উপর জড়াইয়াছেন। নাবিক যত সাঁতার দিয়া জলে অগ্রসর হয়, সতীও তত রুটীর টুকরাগুলিতে বসনের ফের দেন। তিনি যে রূপযৌবনসম্পন্না কুলকন্যা, পর-পুরুষ যে তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়াছে, তাহার সঙ্গে যে আপন অনাবৃত অঙ্গের সঙ্গ ঘটিতেছে, পতিদেবতার রুটী-রক্ষার ব্যস্ততায় পতিব্রতার এ সকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশই ছিল না। এইবার রুটীর ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার হুঁস হইল। ছি ছি, তাই তো নাবিক কি মনে করিল, ভাবিয়া তিনি লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন, রুটীর অঙ্গাবরণ কতকটা উন্মোচন করিয়া আপন অঙ্গ আবৃত করিলেন এবং পতির উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন।

(৫)

যে রুটীখণ্ডের জন্য এত কাণ্ড, সে রুটী কিন্তু শান্তোবার ভোগে আসিল না। শান্তোবাপত্নী সেই ক্লেশ-সমাহৃত এবং

প্রাণান্তপণে সংরক্ষিত রুটীর টুক্‌রাগুলি বসনের আবরণ হইতে বাহির করিয়া বিনীতভাবে পতির সম্মুখে লইয়া ধরিলেন। তিনি যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। সতীর শরীরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কেমন যেন তাঁহার বিস্ময়ের উদ্রেক হইল;—সুন্দরী যেন তাঁহার নয়নে আর কোন্ রাজ্যের সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য্যমাখা—ললিত-ললিত লাবণ্যমাখা—কি এক কমনীয় পবিত্র সামগ্রী বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। অঙ্গনার অঙ্গের পবিত্র গন্ধে শান্তোবার নাসারন্ধ্র ভরিয়া গেল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—যেন নব বসন্তের পূজার ডালি—মধু-ঢল-ঢল ফুল্ল-ফুলকলি লইয়া বনদেবীই দাঁড়ায়ে আছেন। তিনি তো জানেন না যে, যাঁহার শ্রীচরণ-সংস্পর্শে কাষ্ঠের তরণী সুবর্ণ হইয়াছিল, যাঁহার শ্রীঅঙ্গের সঙ্গ পাইয়া কুরূপা কুবুজা রূপদর্পে কন্দর্প-কামিনীকেও পরাভব করিয়াছিল, তাঁহার পত্নী সেই অপূর্ব্ব স্পর্শমণির স্পর্শ পাইয়াছে! তাই তিনি বিস্ময়েবিস্ময়েই বিদ্যুদ্‌-বরণী ঘরণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধ্বি! বল বল, তুমি এই দুরন্ত দুর্য্যোগে দুস্তর নদীর পরপারে আসিলে কি প্রকারে?

পতিব্রতা বলিলেন,—দেব! আপনার আশীর্ব্বাদে নদী-পারে আসিতে বিন্দুমাত্রও ক্লেশ পাইতে হয় নাই, অধিক কি, পারে আসার ব্যাপারটা যেন জানিতেই পারি নাই; কিন্তু পার হইবার পূর্ব্বে বড় উদ্বেগ বড় কষ্ট গিয়াছে। সে কষ্টের কথা কি বলিব। আপনার আদেশে আমি ত ননদিনীর নিবাসে যাইলাম। তাঁহাকে কত করিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া খাদ্যগুলি ফেরৎ দিলাম। তাহার

পর কতিপয় ভবনে ভিক্ষা মাগিয়া এই কয়েক খণ্ড রুটী সংগ্রহ করিলাম। একে আপনি অভুক্ত, তার উপর এতটা পথ একাকিনী আসিতে হইবে, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিবার পথ ধরিলাম। একটু না আসিতে-আসিতে প্রবল ঝড়-জল আরম্ভ হইল। পথ আর চলা যায় না। অনেক কষ্টে পা টিপিয়া টিপিয়া, কতবার পড়িয়া উঠিয়া, নদীতীরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, নদী কাণে কাণ। তীরে তরীবাহক নাই, নীরে তরীও নাই। তরঙ্গিণীর ভঙ্গী দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। ওঃ, ভীমরথীর সে কি ভীষণা মূর্ত্তি! সে যেন রণরঙ্গিণী চণ্ডিকা—শুভ্রফেণার কপাল-মালা গলায় পরিয়া—তরঙ্গ-ভঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছেন! ঘোর ঘনান্ধকারে দিবাভাগেই নয়ন ধাঁধিয়া গেল। চপলার চমক, কি শ্মশানচুল্লীর জ্বলিত জ্বলন,—বৃষ্টির শব্দ, কি চিতাহুতাশনের চটপট-ধ্বনি,—অশনির গর্জ্জন, কি ভীমা-ভৈরবীর হুহুঙ্কার-নিস্বন, কিছুই বুঝিতে পারি না। কাণের কাছে হু হু হো হো আওয়াজ আসে, তাহা কি প্রবল পবনের, কিংবা ভূতপ্রেতের অট্টহাস্যের, কিছুই বুঝিতে পারি না। মড়মড় তড়-বড় শব্দ শুনিতে পাই, তাহা কি বৃক্ষপতনের, কিংবা পিশাচ-নর্ত্তনের, তাহাও বুঝিতে পারি না। মাঝেমাঝে ফেরুপাল ডাকিয়া উঠে। ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। জিহ্বায় যেন রস নাই, শরীরে যেন রক্ত নাই, এক পা অগ্রসর হইবারও যেন শক্তি নাই। প্রাণেপ্রাণেই পাণ্ডুরঙ্গদেবকে ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহার কৃপায় অকস্মাৎ একজন লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি তখন চক্ষু বুজিয়াই আছি। চাহিলেই বা দেখিব কি? কথায় কথায় বুঝা গেল, আগন্তুক একজন নাবিক। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া কাণ্ডারীর করুণা হইল। সে শিশু কন্যার মত আমাকে পৃষ্ঠে চাপাইয়া পার করিয়া দিল এবং এই আশ্রমের পার্শ্বে ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু না পালটিতে-পালটিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

শান্তোবা পত্নীর মুখে পারে আসিবার বর্ণনা শুনিতেছেন, আর কেমন যেন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছেন। তাঁহার সকল শরীর পুলকপূর্ণ। নয়নে দরদর অশ্রুধারা। গদগদ-ভাষে তিনি সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন,—ভাগ্যবতি, তুমি একবার সেই নাবিককে আমায় দেখাইলে না? আমি যে তাঁহারই জন্য অন্তরে আসন বিছাইয়া এই প্রান্তরে পড়িয়া আছি। কই এতদূর আসিয়া এইটুকু আসিতে কি তাঁহার কষ্ট হইল? হউক হউক, তাহাই হউক, সুন্দরি, তুমি ও রুটীর টুক্‌রাগুলি পশুপক্ষীকে খাওয়াইয়া দাও। সেই নাবিক আসিয়া দেখা না দিলে, আমি আর বারিবিন্দুও গ্রহণ করিব না। এই প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া বসিয়া রহিলাম, দেখি তিনি কেমন না আসিয়া থাকিতে পারেন? হায় সতি,—তুমিই ধন্যা! তুমি তাঁহার অমূল্য অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়াছ!

পতির অনুমতি সতীর শিরোধার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ পতির আদেশ প্রতিপালন করিলেন। রুটীর টুকরাগুলি বনের পশু-পক্ষীকে খাওয়াইয়া দিয়া স্বামীর সম্মুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভর্ত্তা যখন অভুক্ত; তখন তিনিই বা আহার করেন কি প্রকারে? ফলে, পতি পত্নী তুইজনে অভুক্ত অবস্থায় সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক বিচিত্র ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভক্ত শান্তোবা কয়েকদিন অভুক্ত; ভক্তাধীন ভগবানের প্রাণে তাহা সহিল না। তিনি উক্ত পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী গ্রামবাসী জনৈক বৈশ্যকে স্বপ্ন দিলেন,—তুমি পর্ব্বতের উপরে যাও, ক্ষুধার্ত্ত ভক্ত শান্তোবাকে সত্বর আহারীয় সামগ্রী দিয়া অমিত পুণ্য অর্জ্জন কর। স্বপ্নাবসানে বৈশ্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নাদি লইয়া শন্তোবার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—মহাত্মন্! আমি জগদীশ্বরের আদেশে এই খাদ্যগুলি আপনার সমীপে আনয়ন করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আহার করিতে আজ্ঞা হউক।

বৈশ্যের কথা শুনিয়া শান্তোবা আরও অধিক অধীর হইয়া পড়িলেন। কাঁদিতে-কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন,—ওগো, তুমি যেই হও সেই হও, আমি তোমার এ খাবার-দাবার কিছুই খাইতেছি না। তুমি কি তোমার সেই খাবার-পাঠানোর হুকুম-করা ঠাকুরকে দেখাইতে পার? সেই হুকুম-করা ঠাকুর এখানে হাজির না হইলে আমি আর কিছুই খাইতেছি না। বৈশ্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও যখন দেখিলেন, শান্তোবার দৃঢ়তা একটুও টসকাইবার নয়, তখন কাজেকাজেই তিনি তাঁহাকে প্রণাম

করিয়া গৃহমুখে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। খাবারগুলি সেই-খানেই পড়িয়া রহিল।

আবার খাবার?—হায় ঠাকুর! এই খাদ্যের ক্ষুধা লইয়াই কি আমি বসিয়া রহিয়াছি? এখনি যাহা মল-মূত্রে পরিণত হইবে, সেই খাদ্য দিয়াই কি তুমি চিরদিন ভুলাইয়া রাখিবে? যাহাতে চিরদিনের ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি হইয়া যায়, সেই তোমার প্রেম-মকরন্দ কি এক বিন্দুও দান করিবে না? হায় হায় ঠাকুর, তুমি এতই কি নিষ্ঠুর? এত সাধি, এত কাঁদি, তবুও কি তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় না? দেখা দাও,—দেখা দাও হৃদয়েশ্বর! দেখা দাও, দেখা দাও। বারবার বলি না,—দয়া ক'রে একটী-বার দেখা দাও, দেখা দাও। এইরূপ রুদ্ধ-শ্বাসে ক্ষুব্ধ-প্রাণে কত-কি বলিতে-বলিতে শান্তোবা দু'বাহু তুলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। দীনের ঠাকুরও অমনই মোহনবেশে তাঁহার নয়ন-সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিয়া শান্তোবার নয়ন-মন ভরিয়া গেল। তিনি প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সুধা পান করিলেন, তাঁহার সকল ক্ষুধা সকল পিপাসা শান্ত হইয়া গেল। শান্তোবা বারবার প্রণাম করেন, ভূমে গড়াগড়ি দেন, উদ্দণ্ড নৃত্য করেন, আনন্দের আতিশয্যে কি যে করেন, কিছুই ঠিক পান না। দয়াময়ের দয়ার গুণ গাহিবার জন্য তাঁহার রসনা নাচিয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠ তাহাতে বিষম বাধা দিল। সে যে তখন গদগদে রুদ্ধ! অনেক চেষ্টার পর অস্ফুট-অস্ফুট কথা ফুটিল। ভাবের তরঙ্গ ছুটিল। মহিমময়ের মহিমা-গানে শান্তোবা সেই স্থানটী সুধাসিক্ত করিয়া তুলিলেন।

ভক্তের এই বিশুদ্ধ-ভাবে ভগবান্ যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বচনের অমৃতসেচনে অভিষিক্ত করিয়া হাসিতে-হাসিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। শান্তোবার নেশা এইবার বেশ জমিয়া গেল। তাহাতেই তিনি সতত বিভোর রহিয়া কায়-মনোবাক্যে বিশ্বপিতার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহার গুণবতী পত্নীও তাঁহার সকল কার্য্যের সহায় হইয়া সহধর্ম্মিণী নাম সার্থক করিতে লাগিলেন।

(৬)

ফুল ফুটে; নিজেই নিজের গন্ধ লুটে না;—পাঁচজনকেও লুটায়। ভক্তের অন্তরে ভাবকুসুম বিকশিত হইলে, তাহার পবিত্র গন্ধে তাঁহার অন্তর ভরিয়া যায়, দূরদূরান্তরের পাঁচজনও তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। শান্তোবার আন্তরিক শান্তি আপন অন্তরেই আবদ্ধ রহিল না; শতশত লোকে তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিল। তাঁহার আদর্শে ও উপদেশে অনেকে আপন গন্তব্য পথ অবধারণ করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। সময়-সময় ভিক্ষা-ব্যপদেশেও তিনি গ্রামেগ্রামে গিয়া গৃহীর গৃহ কৃতার্থ করিয়া আসিতেন। একবার তিনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষার জন্য গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নাই। ব্রাহ্মণী আসিয়া ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক ভিক্ষা দিলেন। আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বিনয়বচনে বলিলেন,—মহাভাগ! আমার স্বামী যখনতখন অকারণ আমার সহিত বিবাদ করেন, আর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার পদপ্রান্তে যাইয়া আশ্রয় লইবেন বলিয়া

শাসাইয়া থাকেন। যদি তিনি তা-ই যান, তবে আমার গতি কি যে হইবে, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার তো আর কেহ নাই দয়াময়! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার স্বামীর মন যেন রোষরহিত এবং পবিত্র হয়।

শান্তোবা ব্রাহ্মণপত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—মাতা! ইহার জন্য এত চিন্তা কেন? আমি ইহার প্রতিকার করিয়া দিব। তুমি এক কার্য্য করিও,—তোমার স্বামী এইবার যখন তোমার সহিত বচসা করিয়া আমার আশ্রমে যাইতে চাহিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে তাহাই করিতে বলিও; তারপর যদি তিনি আমার কাছে গমন করেন, আমি তাঁহাকে ঠিক করিয়া পাঠাইয়া দিব, আর তিনি এক দিনের জন্যও তোমার সহিত কথার লড়াই করিবেন না।

এই বলিয়া শান্তোবা চলিয়া গেলেন। খাবারের বিলম্ব লইয়া আবার একদিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীতে খিটিমিটি বাধিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বাঁধা বুলি আবার আওড়াইয়া বলিলেন,—না, তোমার জ্বালায় আর আমার এখানে থাকা পোসাইল না,—আমি শান্তো-বার শান্তিময় আশ্রমে চলিয়া যাইব। আজ আর ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের গলাবাজীটা চুপিচুপি হজম করিলেন না; তিনি মুখনাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—রোজ রোজ এক কথা শিখেছেন—চ'লে যাবো চ'লে যাবো; তা কোথায় যাবে যাওনা;—ঘড়ির কাঁটা ধোরে কে তোমায় খেতে দেয় একবার দেখে নিই?

মুখেমুখে জবাব পাইয়া ব্রাহ্মণের ভারি অভিমান হইল,— এইবার তাঁহার বৈরাগ্যের গাঙে ভাদ্রের বাণ ডাকিল। আহা,

তাঁহার মুখের খাবার পড়িয়া রহিল; তিনি তাড়াতাড়ি একটা লোটা ও একখানা কম্বল লইয়া—“আচ্ছা তাই চলিলাম”—বলিয়া, এখানে একটা ওখানে একটা পা ফেলিয়া তুপতুপ্ করিয়া চলিয়া চলিলেন। সে চলিবার ধরণ দেখে কে? হনুমানের মত শক্তি থাকিলে বোধ হয়, ব্রাহ্মণ আজ এক লম্ফেই শান্তোবার শান্তি-নিকেতনে চলিয়া যাইতেন।

ব্রাহ্মণ তো যত শীঘ্র পারেন পর্ব্বতের উপরে গিয়া চড়িলেন। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে শান্তোবার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুখে কথা ফোটে না। একটু জিরাইয়া শান্তোবাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—মহাশয়, আমার বাটীতে বড় অশান্তি, পত্নীর সহিত নিত্যই কলহ, তাই সংসারের মায়া ছাড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি; দয়া করিয়া শান্তির পথ চিনাইয়া দিন। শান্তোবা পরিচয়ে ব্রাহ্মণকে চিনিলেন—ইনিই সেই ব্রাহ্মণীর স্বামী। তিনি সুমিষ্ট-সম্ভাষণে তাঁহাকে বলিলেন,—দেখ, তুমি বৈরাগ্য লইয়া আসিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার ঐ কাপড়-চোপড় ও লোটা-টোটা-গুলা বৈরাগীর উপযোগী নয়। তা বাপু, তুমি ঐ কাপড়-চোপড়-গুলা খুলে ফেল, লোটাটা ঐ দিকে সরাইয়া রাখ। আর এই কাঠের জলপাত্রটা লইয়া ঝরণা হইতে জল ধরিয়া আন—হাত-মুখ ধোও, বিশ্রাম কর।

ব্রাহ্মণের বৈরাগ্যের ঝাঁজটা তখনও মিয়াইয়া যায় নাই। তিনি তাঁহার কম্বল টম্বল গা হইতে খুলিয়া ফেলিলেন। সেগুলি এবং লোটাটা এক পাশে বেশ গোছাইয়া-গাছাইয়া রাখিয়া দিলেন।

পরিধানে রহিল—মাত্র এক খণ্ড বস্ত্র। সেই অবস্থায় তিনি সেই কাষ্ঠপাত্র লইয়া জল আনিতে চলিলেন। ব্রাহ্মণ একে পেটুক, তায় মুখের খাবার ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর এতটা পথ চলা,—ক্ষুধায় পিপাসায় তাঁহার শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শাস্তোবার আশ্রমে গেলেই বুঝি পেট পুরিয়া খাইতে পাইব; আমার অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয় তিনি কিছু-না-কিছু আহার করিতে দিবেন-ই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আবার জল আনিতে যাইতে হইতেছে;—বাপ, কি কষ্ট! ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়! জল আনিতে যাইতে-যাইতে তাঁহার বৈরাগ্যের বেগ ক্রমশ কমিয়া আসিতে লাগিল। জল লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তো পা আর চলে না। ক্ষুধা তখন চরমে চড়িয়াছে। বৈরাগ্যের আর সেখানে টেঁকা দায়। এবার বুঝি বৈরাগ্যকেই বৈরাগ্য লইতে হয়। ব্রাহ্মণ জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন,—শাস্তোবা পত্নীসহ আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। জঠরদেবের কঠোর অনুশাসনে তাঁহার শরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মরমের কথাও মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। জলের পাত্র না নামাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—মহাশয় গো, প্রবল ক্ষুধা; কিছু খাইতে দিন। আহা, ব্রাহ্মণ এক হস্তে পেট দেখাইয়া যেরূপ কাতরভাবে ক্ষুধার কথা জানাইলেন, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। মনে হয়—কেন বাপু, তুই ঘর-দোর ছাড়িয়া আসিয়াছিলি? ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় শাস্তোবা তাঁহাকে কিছু বন্য ফল খাইতে দিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণের

মাথাটা কেমন চড়াং করিয়া উঠিল। তাঁহার সে ক্ষুধার খাণ্ডব-অনলে দুইচারিগাছি তৃণকুশে কি হইবে? তিনি তীব্র-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—অ্যাঁ, আমি আপনার ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, আমার জন্য এই সামান্য বন্যফলের ব্যবস্থা? ওতো আমার ঠোঁটে মাখিতেই কুলাইবে না।

ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া শান্তোবার একটু কষ্টও হইল, হাঁসিও পাইল। তিনি তাঁহাকে গম্ভীর-ভাবেই বলিলেন,—বাপু হে, তুমি না বৈরাগ্য করিয়াছ?—সংসারের সকল সামগ্রী, সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ? তা আহারের জন্য অত লালায়িত হইলে চলিবে কেন? এই পথে এ-ই আহার—যখন যাহা জুটিবে তাহাই আহার। তা বন্যফলই বা কি, আর লুচি-মণ্ডাই বা কি? অল্পই বা কি, আর প্রচুরই বা কি?

শান্তোবার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের হরিভক্তি উড়িয়া গেল। আর তাঁহার বৈরাগ্য বজায় রাখা চলিল না। গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রাণটা খাবি খাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার কাপড়-চোপড় ও লোটাটার দিকে দৃষ্টি চালিত করিলেন। ভাবখানা—আর বৈরাগ্যে কাজ নাই বাবা, কাপড়-চোপড় প'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। কিন্তু হায় কি সর্ব্বনাশ, তাহার যে নাম গন্ধও সেখানে কিছুই নাই! লোটাটী দূরে নিক্ষিপ্ত, আর কাপড়-চোপড়গুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ইতস্তত বায়ু-বিচালিত! বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের জল আনিবার অবকাশে শান্তোবাই সে গুলির এইরূপ অবস্থা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—মর্কটবৈরাগীকে ঢিট করিয়া ঘরে পাঠানো।

তাঁহার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন,—তাঁহার কাপড়-চোপড়গুলি সকলই নষ্ট হইয়াছে, তখন তাঁহার আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিল না। একে ক্ষুধা, তার উপর এই লোকসান। গা'টাও কেমন শীতশীত করিতেছিল। দুঃখে ক্ষোভে তিনি বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। বৈরাগ্যের কঠোরতা এইবার তাঁহার প্রাণেপ্রাণে অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে-কাদিতে শান্তোবাকে কহিলেন,—মহাশয়, বাড়ীতে থাকিলে এতক্ষণে আমার পত্নী আমাকে দু'একবার আহার করিতে দিতেন। আমার মূর্খতা আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর! আমি তো তাঁহাকেও চটাইয়া চলিয়া আসিয়াছি। এখন আমি কোন্ পথে যাই, কি করিয়া জঠরের জ্বালাই বা জুড়াই, তাহারই উপযুক্ত উপদেশ দিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন।

শান্তোবা বলিলেন,—বাপু হে, বৈরাগ্যের পথ বড় বিষম পথ। এ পথে আসিলে সংযমের সবিশেষ আবশ্যক। যে ফুঁকা শিশির মত টুস্‌কির ভর সহিতে পারে না, কথায়-কথায় কচি-খোঁকার মত প্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, সে যেন কখনও এ পথের ত্রিসীমা না মাড়ায়। মর্ম্মান্তিক দৃঢ়তার যষ্টি অবলম্বন করিয়া অতি সতর্ক-পদে এই শাণিত-ক্ষুরধারা-সমাস্থিত পথে বিচরণ করিতে হয়। বাবা, তোমার এখনও সময় হয় নাই—এ পথে আসিবার যোগ্যতা জন্মে নাই। গৃহের পথই এখন তোমার প্রকৃত পথ। গৃহে থাকিয়াই এখন তুমি যথাযথ গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে, যে শাস্ত্র

লাভ করিলে সকল ক্ষুধা দূরে যায়, ধর্ম্মের নিষ্ঠা থাকিলে ক্রমে-ক্রমে তাহারও পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি। তোমার পত্নীকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার সহিত তোমাকে মিলিত করিয়া দিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া শান্তোবা ব্রাহ্মণকে লইয়া তাঁহার আবাসে গমন করিলেন এবং তাঁহার পত্নীর সহিত বিবাদ মিটাইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় ব্রাহ্মণকে শেষ কথা বলিয়া আসিলেন,—দেখ, সাবধান, তুমি আর যেন সহধর্ম্মিণীর সহিত অকারণ বচসা করিওনা। শ্রীহরির কৃপায় তোমাদের সংসার শান্তিময় হউক।

পতি-পত্নী ভক্তিভরে শান্তোবার শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। পতিব্রতা পরমাদরে পেটুক পতিকে আহার করাইলেন। তাঁহার ধড়ে যেন প্রাণ আসিল। মনেমনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—বাপ নাকে খং, বৈরাগ্যের নাম আর কখনও মুখে আনিব না;—অন্তত পোড়া পেটের জ্বালাটাকে যত দিন জয় করিতে না পারি।

(৭)

পণ্ঢারপুর সে দেশে প্রসিদ্ধ তীর্থ—ভূস্বর্গ বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীএকাদশীর দিন সেখানে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। শত শত—সহস্র সহস্র—কখনও বা লক্ষ লক্ষ ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভগবানের নামসংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। শান্তোবার ইচ্ছা হইল, তিনি পণ্ঢারপুরে থাকিয়া কিছুদিন সেই আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি তাঁহার পত্নী এবং কয়েকজন ভক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে

লইয়া বিবিধ বাদ্য সহযোগে শ্রীহরির নাম-গানে শুষ্ক-মরুময়-সংসারে স্বর্গীয় সুধা ঢালিতে-ঢালিতে সেই পার্ব্বত্য আশ্রম হইতে চলিতে লাগিলেন। এইরূপ নামসুধা বিলাইতে-বিলাইতে তাঁহারা নরসিংহ-পুরম্‌ নামক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সে দিন দশমী তিথি। রাত্রি-কাল। পণ্ঢারপুর ও নরসিংহপুরম্‌ উভয়ের মধ্যে এক নদীর ব্যবধান। প্রবল বর্ষায় নদীতে বন্যা আসিয়াছে। তরঙ্গ-আবর্ত্তে তৃণখণ্ডও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। নৌকা নাই, নাবিক নাই। এক সন্তরণ ভিন্ন পারে যাইবার অন্য উপায় নাই। নদীর বিভীষিকা-ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সহজে তাহার কাছে যাইতেও সাহস হয় না। অথচ রাতি পোহাইলেই একাদশী। প্রাতেই পণ্ঢারপুরে গিয়া বিঠ্‌ঠলদেবের পূজা করা চাই। সুতরাং তখনই নদী পার হইতে হয়। শান্তোবা দেখিলেন,—তাঁহার সঙ্গিগণ তরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গ দর্শনে বড়ই বিচলিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে সাহসের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—তোমরা কি এই ক্ষুদ্র নদীর দুইটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ দেখিয়া ভীত চকিত হইয়াছ? যাঁহার নাম লইলে অপার ভববারিধি গোষ্পদ-তুচ্ছ হইয়া যায়, আমাদের সেই সর্ব্ববলে বলীয়ান ভগবান্‌ শ্রীহরি থাকিতে কি এই সামান্য নদী-পারের চিন্তা করিতে হইবে? চিন্তা ছাড়,—চিন্তা ছাড়,—সকল চিন্তা সেই চিন্তামণিময় করিয়া লও। মুখে তাঁহারই নাম লও, আর এস, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হও। বাঁচা-মরার কথা ভাবিও না, সে ভাবনা যিনি ভাবিবার তিনিই ভাবিবেন। এস আমার পশ্চাৎপশ্চাৎ চলিয়া এস,—হরিনামের উচ্চরোলে নদীর

জল গগনমণ্ডল কাঁপাইয়া তোল। এই বলিয়া শান্তোবা হরিহরি-ধ্বনি করিয়া নির্ভয়ে নদীর জলে নামিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও ব্রাহ্মণগণও সমস্বরে হরিহরি বলিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কাহারও প্রাণে ভয় নাই। সকলেই আত্ম-বিস্মৃত। সকলেই কি-এক আনন্দে উৎফুল্ল। হইবারই কথা। আনন্দময় হরি যে তখন সকলেরই অন্তর জুড়িয়া। তাঁহাদের সেই উচ্চকণ্ঠের হরিনাম নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে, তীর-তরুর পত্রে পত্রে, নভস্থলীর নক্ষত্রে নক্ষত্রে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নামময়—হরিময়! যে নাম, সে-ই নামী। নামের আগমনে নামীর আগমন হইল। নামের দয়ায় নামীর দয়া হইল। দেখিতে-দেখিতে নদীর অতলজল একহাঁটু হইয়া গেল। পার হইতে আর কাহাকেও ক্লেশ পাইতে হইল না। সুদৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারিলে এইরূপই হয় বটে? বিশ্বাসতো সহজ নয়। সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে, সেই তরঙ্গসমাকুলা ভীষণা নদী। প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া, এক নামের বল ধরিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করা কি সহজ? এ বিশ্বাস কি সহজ বিশ্বাস?

নদীর পরপারে গমন করিয়া তাঁহারা পরমানন্দে ভজন-গান জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদের সেই ভৈরবরাগের প্রভাতী-সঙ্গীতে চারিদিকটা যেন কি-এক মাদকভাব মাখানো হইয়া গেল। সে গান যাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার ভিতরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলেও চোখের কোলের ঘুমের ঘোর যেন আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে পূর্ব্ব-গগনে অরুণদেবের উদয় হইল।

পাখী সব ডাকিয়া উঠিল। তারাও যেন ভৈরব-রাগে ভজন-গান করিল। শান্তোবা সপরিকরে চন্দ্রাবতী-(চন্দ্রভাগা ?)-নদীর পবিত্র জলে যাইয়া অবগাহন করিলেন। সকলেরই দেহ-মন পবিত্র হইয়া গেল। পবিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক তাঁহারা দেবমন্দিরে গমন করিলেন। প্রথমেই পুণ্ডলীক বা পুণ্ডরীককে পূজা করিয়া তৎপরে সকলে পাণ্ডুরঙ্গ বা বিঠ্‌ঠলদেবের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরি এই পুণ্ডলীককে বরদান করিবার জন্যই পাণ্ডু-রঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার পূজা সর্ব্বাগ্রে। তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, গড়াগড়ি দেন, কত স্তবস্তুতি পড়েন, হাসেন কাঁদেন চীৎকার করিয়া উঠেন, বাহু তুলিয়া গীতিনৃত্য করিতে থাকেন,—সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে ?

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। শান্তোবা অন্তরে-অন্তরে এতদিন যাঁহার আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, আজ বাহিরে তাঁহাকেই বিঠ্‌ঠলরূপে বিরাজিত দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বারবার শ্রীমূর্ত্তিকে দেখেন আর ভাবেন,—হায় প্রভু! এতদিনে দেখা দিলে,—এতদিনে কি অধম ব'লে মনে হ'ল ? কৃপাময়! তোমার কৃপাশক্তির জয় হউক—জয় হউক। শান্তোবার জিহ্বা এইবার প্রভুর মহিমা গাহিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার কেবল ব্যাকুলতাই সার; সে কিছু বলিতে পারিল না। কণ্ঠ যে পূর্ব্ব হইতেই গদগদে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শান্তোবা কাঁদিয়াই অস্থির; চোখের জল

আর থামে না, জলেজলে চক্ষের দ্বারও বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সেই বোজা-চোখেই দেখিলেন,—বিঠ্‌ঠলদেব তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সকল মন সকল প্রাণ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তিনি প্রাণেপ্রাণেই প্রার্থনা জানাইলেন,—প্রিয়তম! আমি তোমারই তরে সর্ব্বত্যাগী, দেখো যেন ভুলোনা, চরণে স্থান দিয়া আবার যেন চরণচ্যুত ক'রো না। ওহে ও শ্যামলসুন্দর! তোমার মহিমার সীমা নাই পার নাই। অনন্তদেব সহস্র-বদনে গান করিয়াও অদ্যাবধি তাহার অন্ত পাইলেন না, তখন আমরা আর তাহার কি বুঝিব বল? তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা গৃহত্যাগী,—তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা পর্ব্বতবাসী,—তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা বৎসপদের মত এই ভীষণ নদীর পারে আগমনে সমর্থ,—আর তোমার মহিমার গুণেই শান্তোবা আজ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ। হায় প্রভু! তোমার মহিমার গুণেই কি শান্তোবা তোমার চরণ-কমলের চির অনুচর হইয়া থাকিতে পারিবে না? তাই কর নাথ! তাই কর। আর কিছু প্রার্থনা করি না,—তাই কর নাথ! তাই কর।—তোমার একান্ত আশ্রিত শান্তোবাকে তোমার চরণের চির অনুচর করিয়া রাখিয়া দাও।

প্রাণনায়ককে এইরূপ প্রাণের কথা জানাইতে-জানাইতে শান্তোবার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন,—বিঠ্‌ঠলদেব দুইটি হাত কোমরে দিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গী ধরিয়া তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে দাঁড়ায়ে আছেন, আর হাসি-হাসিমুখে বলিতেছেন,—প্রিয়তম! থাক-থাক তুমি এইখানেই

থাক, তোমাকে পাইয়া আজ আমার আনন্দ আর ধরে না। এখানে থাকিয়া তুমি এই আনন্দ আস্বাদন কর। আমিও দেখিয়া সুখী হই।

শ্রীহরির আদেশে শান্তোবা পত্নীসহিত সেই পণ্ঢারপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়া-বিগলিত আলুথালু ভাব,—নাম-গানে অসাধারণ অনুরাগ দর্শনে অনেকেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। মহৎসঙ্গের অব্যর্থ ফলে অনেকেই আপন জীবন মধুময় করিয়া তুলিলেন।

জগন্নাথ দাস।

জগন্নাথদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিবাস পুরুষোত্তমধামে। তিনি একজন অতীব শিষ্টস্বভাব জ্ঞানবান্ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অকপট ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভাবে নিরানন্দ কাহাকে বলে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার একমাত্র বিষম ভয়—এই ঘোরতর সংসার কিরূপে পার হইব। তিনি দিন নাই রাত্রি নাই কেবল ওই কথাই আলোচনা করেন, আর মনেমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন,—প্রভু হে, এই অপার ভব-পারাবার পার হইবার কাণ্ডারী তুমি—কৃপা করিয়া তুমি পার না করিলে এ অধম জীবের নিস্তারের উপায় আর নাই। নাথ! আমি তোমার ঐ চরণে শরণাগত, আমায় নিজগুণে উদ্ধার কর,—ভজনহীনে বিমল ভজন শিখাইয়া আত্মসাৎ কর।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন শয়নের সময় জগন্নাথদাস শ্রীহরির পাদপদ্মে মনেমনে প্রার্থনা জানাইলেন,—প্রভু হে! তুমি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা বিস্তার কর,—ভক্তি না দাও—প্রেম না দাও—তোমার মহিমা আমাকে কিঞ্চিৎ দেখাও, তাহা হইলেই আমি আরও অধিকতর বিশ্বাসের সহিত তোমার ভজন করিতে পারিব। দয়াময়! আমি তোমার একান্ত অনুগত। দীনবন্ধু! তুমি ভিন্ন আর আমার কেহই নাই। আমি প্রাণের কথা তোমায় জানাইলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা। এইরূপ

বলিতে-বলিতে,—চিত্তে: চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিতে-করিতে জগন্নাথদাস নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নারায়ণ তাহা জানিলেন। শরণাগতের অভয়দাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই তিনি দাসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট। কর্ণে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান। পরিধানে পীতবসন। অঙ্গেঅঙ্গে নানা আভরণ। অধরে মধুর হাস্য। তিনি মেঘ-নির্ঘোষে বলিলেন,—প্রিয়তম! তোমার এত চিন্তা কেন? তুমি যখন আমাকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়াছ, তখন আর তোমার ভয়-ভাবনা কিসের? এই এস আমি তোমায় দীক্ষা দান করিতেছি—ইহাতে তুমি উদ্ধার লাভ করিবে। সকল শাস্ত্রের মধ্যে সার একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ এই প্রণবমন্ত্র তোমাকে দান করিলাম, গ্রহণ কর। এই মন্ত্রই 'ভাগবত' নাম দিয়া আমি অনন্তকে দান করিয়াছিলাম। তিনি ব্রহ্মাকে দান করেন। বিধাতা বহুদিন অন্তরেঅন্তরে জপ করিয়া এই মন্ত্রই চতুঃশ্লোকীরূপে প্রকাশ করেন। তিনি আবার নরনারায়ণকে তাহা উপদেশ করিলেন। নরনারায়ণ তাহাকে দশটি শ্লোকে বিস্তৃত করিয়া নারদ-মুনিকে কহিলেন। নারদ আবার শত শ্লোকে পরিণত করিয়া বেদব্যাসের অগ্রে কীর্ত্তন করিলেন। তিনি আঠার হাজার শ্লোকে বিস্তার করিয়া আপন পুত্র শুকদেবকে শিখাইলেন। তিনি আবার অগণিত মুনি-ঋষির সমাজে প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিতের সমীপে তাহা কীর্ত্তন করিলেন। তাহাতেই মহারাজ পরীক্ষিত এই ভীষণ ভবসাগরের পারে গমন করিয়া পরম-কারণ আমাকে

প্রাপ্ত হইলেন। এই মহাপুরাণ ভাগবতই ভবসাগরের পারে যাইবার একমাত্র পরম উপায়। তুমি প্রাকৃতবন্ধে এই পুরাণের গীতি রচনা কর; আপনি নিশ্চয় পবিত্র হইবে, অশেষ প্রাণীকেও পবিত্র করিবে। তোমার এই ভাগবত যে একবার কর্ণে শ্রবণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যাইবে। নাও, তুমি আর বিলম্ব করিও না; কার্য্য আরম্ভ করিয়া দাও,—জগতের মঙ্গল করিয়া পরম মঙ্গলের অধিকারী হও। জগন্নাথদাস প্রভুর শ্রীমুখের এই আজ্ঞা পাইয়া—স্বপনেই তাঁহাকে জানাইলেন,—দয়াময়! আমি মহামূর্খ, তোমার এ আদেশ কিরূপে প্রতিপালন করিব? যে ভাগবতের মহিমা মহানুভব মুনিগণের অগোচর, তাহার তত্ত্ব আমি কি প্রকারে প্রাকৃতবন্ধে প্রকাশ করিব? শুনিয়া ভগবান বলিলেন,—প্রিয়তম! তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। ভীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গীতিবচনায় প্রবৃত্ত হও,—আমি তোমার হৃদয়কমলে বসিয়া যাহা যাহা বলিয়া দিব, তাহাই পত্রের উপর ছত্রেছত্রে লিখিয়া যাও। প্রফুল্ল-মুখে এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। এমন সময় জগন্নাথদাসেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দ ধরে না। অন্তর-বাহির আনন্দে গরগর। তখনই তিনি লেখনী-পত্র লইয়া লিখিতে বসিলেন। লিখিবেন কি; অশ্রুপ্রবাহে নয়ন অবরুদ্ধ;—বাহিরের কিছু দেখিতেই পাইলেন না। অন্তরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন,—অন্তরবিহারীর দিব্য মূর্ত্তি তথায় দেদীপ্যমান। এইবার তাঁহার সকল

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে কবাট পড়িয়া গেল। তিনি যাঁহাকে দেখিবার,—সকল ইন্দ্রিয় দিয়া—মন দিয়া—প্রাণ দিয়া তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন। এদিকে ছত্রেছত্রে পত্রকলেবর পূর্ণ করিয়া তাঁহার লেখনী অবিরামগতি চলিতে লাগিল। কত পল মুহূর্ত্ত প্রহর দিন পক্ষ মাস বা বৎসর অতিক্রান্ত হইল, কেহ জানে না,—স্বয়ং লেখক জগন্নাথদাসও তাহা জানেন না, ফলে অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের পরম রমণীয় ভাষা-গীতি বিরচিত হইয়া গেল। এইবার জগন্নাথদাস অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। চাহিয়া দেখেন,—কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত, অহো, সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধেরই ভাষানুবাদ হইয়া গিয়াছে! কি অদ্ভুত কি অদ্ভুত,—অহো, কঠিন কঠিন—অতি কঠিন স্থলেরও প্রাঞ্জল কোমল কান্ত পদাবলী রচিত হইয়া গিয়াছে! তবে আর কেন,—যাই, প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করি,—এই শ্রবণমঙ্গল ভাগবতগীতি গান করিয়া জীবের পাপ-তাপ বিনাশ করিয়া বেড়াই।

জগন্নাথদাস ভাগবত গান করিয়া দেশেদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। সে গান শুনিয়া মানবের কথা কি,—পশু পক্ষীও ভুলিয়া যাইতে লাগিল। ভুলিবারই কথা বটে,—সামান্য অর্থ বা ধনের লালসায় যাহারা গান করিয়া থাকে, তাহাদেরই গ্রাম্য-গীতি যখন এত মিষ্ট লাগে, তখন একমাত্র পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া—জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া, সেই জগতের নাথ জগন্নাথকে জগন্নাথদাস যে অপ্রাকৃত ভাগবত-গীতি শ্রবণ করাইতেছেন, তাহা সুধা-সুমধুর

না হইবে কেন? সে গানে নিখিল প্রাণীর প্রাণে-কাণে সুধাধারা ঢালিয়া না দিবে কেন? তরুর মূলে জল নিষেচন করিলে, বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা পত্র পুষ্প ফল বল্কল সকলই প্রীতিলাভ করে। জগন্নাথদাস সেই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির পাদমূলে যে গীতিসুধা ঢালিয়া দিতেছেন, তাহাতে বিশ্ববাসী কে না প্রীতিলাভ করিবে?

রমণীগণ কিছু অধিক গীতি-প্রিয়। তাঁহারা জগন্নাথের গানে কিছু বেশীবেশী বিমোহিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পথ দিয়া জগন্নাথদাস ভাগবতগীতি গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। তাঁহার শরীর পুলকিত। নয়ন অশ্রুসিক্ত। অঙ্গেঅঙ্গে ভাব-তরঙ্গ। শিশুর দল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার মুখ-পানে তাকাইয়া অবাক হইয়া চলিয়াছে। বড়বড় ঘরের রমণীগণ তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেই লজ্জা-সরম ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া আসেন, তাঁহাকে আদর করিয়া অন্দরের মধ্যে লইয়া যান, সকলে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া ঘিরিয়া বসেন, আর যেন কত আত্মীয়ের মত তাঁহার কাছে শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার গান শুনিবার আবদার করেন। জগন্নাথ-দাসও ভাবে বিভোর হইয়া বিষয়-বিষের মহৌষধি—পদেপদে সুধার নদী ভাগবতগীতি-সুধায় তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিতে থাকেন। সেই অশেষ জন্মের পাপহারিণী হরিলীলা শ্রবণ করিয়া নারীবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করেন। অনেক ধন-রত্ন বসন-ভূষণ দিয়া বিনয়-বচনে তাঁহাকে বলেন,—ওগো, তুমি প্রতিদিন আমাদের আবাসে একবার করিয়া আসিও,—শ্রীকৃষ্ণের মধুরমধুর লীলা-গান শুনাইয়া পবিত্র করিয়া যাইও।

জগন্নাথদাসের গোবিন্দগীতি শ্রবণের জন্য সকলের এতই আগ্রহ,—কিন্তু বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি খলজনের তাহা ভাল লাগে না। জগন্নাথদাসের আদরযত্নটা যেন তাহাদের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তাঁহার অযথা কুৎসা প্রচারের জন্য তাহাদের জিহ্বাগুলি নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। পরের প্রশংসার পরিবর্ত্তে নিন্দা প্রচার করাই যে তাহাদের স্বভাব,—উৎকৃষ্ট বস্তুকে অপকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত করাই যে তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম।—

"কাক-চাণ্ডাল যেউ পরি। উত্তম দ্রব্য ভ্রষ্ট করি॥
শ্বান-চাণ্ডাল যেহ্নে দাণ্ডে। ধাইঁণ যাউথান্তি চাণ্ডে॥
দেখিলে তুলসীবৃক্ষরে। চরণ টেকি মূত্র করে॥
মূষিক যেহ্নে দিব্য বাস। দন্তে কাটিণ করে নাশ॥
কিঞ্চিতে ন করে আহার। নাশিবা কথা মূল তার॥
সেহি প্রকারে মূঢ় নরে। দোষ দিঅন্তি সাধুঠারে॥"

উত্তম সামগ্রী নষ্ট করাই কাকের কার্য্য। তুলসীবৃক্ষ দেখিলে দৌড়িয়া গিয়া তাহার অঙ্গে মূত্র ত্যাগ করাই কুক্কুরের ধর্ম্ম। দিব্য বস্ত্র দন্তে করিয়া কাটিয়া নষ্ট করাই মূষিকের ব্যবহার। সেই প্রকার সাধুর দোষ উদ্ঘাটন করাই জ্ঞানহীন খলের একমাত্র অনুষ্ঠান।

জগন্নাথদাসের এই অন্দরমহলের আদর ব্যাপারটা খলের দল কল্পনার তুলিকায় অতিরঞ্জিত করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গোচরে আনয়ন করিল। বলিল,—মহারাজ! দেখুন—আপনার এই পুণ্যক্ষেত্রে কি অপবিত্র অনুষ্ঠানই আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জগন্নাথদাস ছাপা তিলক মালা ধরিয়া কপট-ব্রহ্মচারীর বেশে

অনেক স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে। সে কক্ষে একখানি পুস্তক্ রাখিয়া সকল ঠাঁই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে রমণীবৃন্দ দেখিতে পায়, আনন্দমনে সেইখানেই বসিয়া সেই পুস্তক হইতে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। মাথা নাড়িয়া—হস্ত ঘুরাইয়া তাহার সেই গানের নানামত ব্যাখ্যারই বা বাহার দেখে কে? সরলা অবলাগণ তাহার সেই গানের ফাঁদে পড়িয়া যায়, আর নানা প্রকারে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। বুঝি বা পতিকেও তাহারা এত সেবা করে না। মহারাজ, আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, দূত প্রেরণ করিলেই আপনি সকলি জানিতে পারিবেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি অতিশয় কুপিত হইলেন। দূতের প্রতি আদেশ দিলেন,—যাও, শীঘ্র যাও, সত্বর জগন্নাথ-দাসকে ধরিয়া লইয়া আইস। ব্যাপারখানা একবার আমাকে বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। রাজার আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই দিকে-দিকে দূতের দল ধাবিত হইল। দেখিতে-দেখিতে জগন্নাথদাসকে ধরিয়া আনিয়া নৃপতির সম্মুখে হাজির করিল। নরনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই কোপস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হে জগন্নাথদাস, এ তোমার কিরূপ আচরণ? তুমি নাকি পুরুষ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-সমাজে গান গাহিয়া বেড়াও? তুমি নাকি দিবা-রজনী রমণী-সঙ্গে অবস্থান কর? বল, সত্য করিয়া বল, এ কথা সত্য কি না?

নৃপতির কথা শুনিয়া জগন্নাথদাস একবার নয়ন মুদিয়া চিত্তে চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন,

—মহারাজ, খলের বচন শ্রবণ করিয়া নিরপরাধের নিগ্রহ করা রাজার ধর্ম্ম নহে। আমার অন্তরের ভাব আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ জাতি, যে কেহ আমাকে আদর করিয়া ডাকে, আমি তাহারি কাছে বসিয়া ভাগবত গান করিয়া থাকি। তা স্ত্রী নাই পুরুষ নাই, বালক নাই বৃদ্ধও নাই। দণ্ডধারি! আমি ব্রহ্মচারী। আমি পুরুষের কাছে পুরুষ, রমণীর কাছে রমণী। তাই শ্রীহরির কৃপায় আমার কোন সঙ্গে ভয় করিবারও কিছুই নাই।

জগন্নাথের কথা শুনিয়া নৃপতির শরীর ক্রোধভরে থরথর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দন্তে অধর চাপিয়া, রোষভরে বলিয়া উঠিলেন,—হাঁহে হাঁ—খুব পাকা পাকা কথা কয়টা বলিয়া ফেলিলে বটে, কিন্তু তোমার এ কথায় বিশ্বাস করি কি প্রকারে? তুমি যদি পুরুষের কাছে পুরুষ, রমণীর কাছে রমণী, তবে কই তোমার রমণীর স্বরূপটা একবার আমাদের দেখাও দেখি? যদি দেখাইতে পার উত্তম, না পার বিপ্র-টিপ্র মানিব না,—সমুচিত দণ্ড দান করিব। প্রহরিগণ! যাও শীঘ্র এই কপটীরে লইয়া কারাগারে রাখিয়া দাও। এই বলিয়া নৃপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রহরিগণও সাধু জগন্নাথদাসকে লইয়া বন্দিশালায় বদ্ধ করিয়া রাখিল।

সাধুর স্বর্গ নরক সকলই সমান। সকল স্থানেই তাঁহার হৃদয়ে-হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের সুখদ সঙ্গ। তাই বন্দিগৃহেও

জগন্নাথদাসের আনন্দের অসদ্ভাব নাই; তিনি পরমানন্দে সেই আনন্দকন্দ নন্দনন্দনের পদদ্বন্দ্ব ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি আপন মনে মনের ঠাকুরকে কত কথাই বলেন। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেন। কখনও ঊর্দ্ধবাহু তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন। কখনও বা নিবাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। আবার কখনও বা একান্ত আর্ত্তের ন্যায় কাতর-স্বরে প্রভুর করুণা ভিক্ষা করেন। বলেন,—গোপীনাথ! আমায় রক্ষা কর। আমার জন্য আমাকে রক্ষা করিতে বলি না,—তোমার ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমায় রক্ষা কর। তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ। আমারও লজ্জা,—শুধু আমার নয় তোমার ভক্ত-জগতের লজ্জা নিবারণ কর। তুমি আমার পুরুষস্বরূপ ঘুচাইয়া দিয়া স্ত্রীস্বরূপ করিয়া দাও; তা দেখিয়া প্রতাপরুদ্র নরপতি লজ্জায় মস্তক অবনত করুক, আর খলের মুখে চূণ-কালী পড়ুক। প্রভু হে, তুমি মূর্খের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া সাধুর মহিমা প্রকাশ কর।

প্রাণনাথকে এইরূপ কত কথা বলিতে-বলিতে জগন্নাথদাস ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রাণনাথও অমনি সেই বন্দিঘরে আসিয়া তাঁহার মস্তকে অভয়-পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া কহিলেন,—জগন্নাথ, প্রিয়তম, তুমি কি ভীত হইয়াছ? আমি যাহার সহায়, সামান্য এ রাজ্যের রাজার কথা কি, তাহার ভয় করিবার কোথাও কিছু আছে কি? এই দেখ, আমার হস্তের দিকে চাহিয়া দেখ, এই তেজোদীপ্ত সুদর্শন দর্শন কর। ইহাকে তোমাদের ভয় দূর

করিবার জন্যই রাখিয়াছি। ছার প্রতাপরুদ্র, তাহাকে আবার ভয় কিসের? তোমার যখন রমণীর স্বরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, —তাহা সিদ্ধ হইবে। আমার ত আর স্বতন্ত্র কিছু ইচ্ছা নাই, —তোমাদের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তোমরাই আমার 'স্ব'—আপন জন। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করি বলিয়াই আমি 'স্বেচ্ছাময়'। ভাল, তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তোমার নরতনু যাইয়া নারীতনু হউক। এই বলিয়া অন্তর্য্যামী অন্তর্হিত হইলেন। দাসেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি মনেমনে ভাবিলেন,—শরণাগত-বৎসল শ্রীহরি আমার বিপত্তি দেখিয়া নিশ্চয় করুণা করিয়া গিয়াছেন। আহা, তাঁহার শ্রীচরণের অমিয়ময় স্পর্শ যেন এখনও অনুভব করিতেছি! কই,—দেখি, আমার পুরুষমূর্ত্তির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা? তাহা হইলে প্রকৃত বুঝা যাইবে, ইহা প্রভুর করুণালীলা, কি স্বপ্নের খেলা। মনেমনে এইরূপ বলিয়া জগন্নাথদাস আপনার দেহের দিকে চাহিয়া দেখেন,—অহো, কি বিচিত্র কি বিচিত্র, এ যে কমনীয় কামিনী-মূর্ত্তি! আনন্দ-বিস্ময়ে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরিয়া গেল। মনেমনে ভাবেন,—অহো, শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম-স্পর্শে আমার জীবন ধন্য হইয়া গেল!—

"যেবণ পাদপদ্ম লাগি। অহল্যা হেলা মোক্ষভাগী॥
যেউ চরণ লাগি করি। কুবুজা হোইলা সুন্দরী॥
যেবণ পাদপদ্ম ভলে। ফণী-মণিকি চিত্র কলে॥
যেবণ পাদপদ্ম-বারি। শঙ্কর মউলিরে ধরি॥

সংসারে গঙ্গারূপে বহি। অশেষ প্রাণিঙ্কি তারই ॥
সে পাদপদ্মরজ পাই। পবিত্র হেলি আজি মুহিঁ ॥"

যে চরণকমল-স্পর্শে অহল্যার উদ্ধার, যে পাদপদ্মের সম্বন্ধে কুবুজা রূপসী, যে শ্রীচরণ-সরোজ-সংস্পর্শে কালীয়ের মস্তকমণি চিত্র-বিচিত্র, ত্রিভুবন-তারণকারী যে পাদপঙ্কজবারি শঙ্কর জটায় ধরিয়া গঙ্গাধর, অহো, আজ আমি সেই চরণরজের স্পর্শ পাইয়া পবিত্র হইলাম। আর আমার ভয় কি? আমার প্রভুতো অমিত বলে বলীয়ান্! এইবার যাই, একবার সকলকে প্রভুর প্রভাবটা দেখাইয়া দিই। এই বলিয়া তিনি আনন্দমনে রাম-কৃষ্ণ-হরি-নাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে বন্দিমন্দিরের বাহিরে আসিলেন। রাজ-দূত ও প্রহরিগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—চল, তোমাদের রাজার দরবারে চল, আমার স্ত্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার কোপের শান্তি করিয়া আসি। দূত-দৌবারিকবৃন্দ এই আচম্বিত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৃপতির নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার সেই কমনীয় কামিনীমূর্ত্তি—সেই রমণী-সুলভ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাবভাব প্রভৃতি দর্শন করিয়া মহা বিস্মিত হইলেন। মনেমনে বলেন,—অহো, কি অতুলনা ললনামূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি দেখিলে মুনি-ব্রহ্মচারীরও মন ভুলিয়া যায়। জগন্নাথদাস কেমন করিয়াই বা এমন মূর্ত্তি ধারণ করিল? এ নিশ্চয় সেই গোবিন্দেরই মায়া বলিতে হইবে।

এইরূপ বিচার করিয়া মহারাজের মনে একটু ভয় হইল;—তাই তো আমি কাজটা বড় ভাল করি নাই। পরে ভাবিলেন,

—ভাল, একবার ব্যাপারখানা বুঝাই যাউক। তিনি প্রকাশ্যে তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে ও জগন্নাথদাস! তুমি তো খুব বুজরুকি জাহির করিয়াছ, দেখিতেছি। তা শুধু ও রমণীর মূর্ত্তিখানি দেখাইলে চলিতেছে না, কিছু স্বভাবের পরিচয়ও দিতে হইতেছে। না হ'লে বেশ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

নরনাথের কথা শুনিয়া জগন্নাথ একবার তাঁহার প্রাণনাথকে মনেমনে ভাবিয়া লইলেন, তার পর নৃপতির পানে নয়নকোণে চাহিয়া, ফিক্‌ফিক করিয়া শরমের হাসি হাসিয়া, অবনত-আননে কহিলেন,—মহারাজ! আমাকে আর কত পরীক্ষা করিবেন? এই দেখুন,—দেখাইতে লজ্জা হয়, এই আমার বসনের দিকে চাহিয়া দেখুন; কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি?

জগন্নাথদাসের অদ্ভুত প্রভাব! দেখিতে-দেখিতে সর্ব্বজন-সমক্ষে তাঁহার বস্ত্র বিবর্ণ হইয়া গেল,—রমণীর ঋতুকালীন লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দেখিয়া নৃপতি প্রভৃতি পরম বিস্মিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—মহারাজ! আর পরীক্ষায় প্রয়োজন নাই। আমাদের মনের ভ্রম দূর হইয়াছে। জগন্নাথ-দাস নিশ্চয়ই সেই নীলাচলনাথ জগন্নাথের দাস। সাধু-অপরাধে অপরাধী হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

সকলের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ জগন্নাথদাসের চরণে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; বিনয়-বচনে ও বসন-ভূষণে তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিলেন এবং বলিলেন,—আপনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে তাহার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীমুখে

শ্রীভাগবতগীতি শুনাইতে আজ্ঞা হউক; আমার কর্ণ মন পবিত্র হউক, অশেষ জন্মের পাপতাপও বিনষ্ট হউক।

জগন্নাথদাস আনন্দমনে নৃপতির প্রার্থনা স্বীকার করিলেন। আচ্ছা, আমি স্নানাহ্নিক সারিয়া গান করিতেছি, বলিয়া পুষ্করিণীর জলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি জলমধ্যে গিয়া প্রাণনায়ককে প্রাণেপ্রাণে ডাকিলেন,—আবার পুরুষস্বরূপ প্রাপ্ত হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ যাহাদের হাতধরা, তাঁহাদের কোন্ প্রার্থনাটাই বা ভগবান্ অপূর্ণ রাখেন? ভগবানের কৃপায় তখনই জগন্নাথদাসের পুরুষস্বরূপ হইয়া গেল। তিনি স্নান সমাপন করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে পুরুষমূর্ত্তিতে জল হইতে উঠিলেন। পূজা-আহ্নিকাদি সারিয়া রাজসভায় গিয়া তাঁহার সেই প্রাকৃত-ভাগবত গান করিতে লাগিলেন।

ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র। ভক্তিই ভাগবতের প্রাণ। ভাগবতের ব্যাখ্যা বল, যাহা বল, সকলের মূলে ভক্তি চাই। জগন্নাথ সেই ভক্তি মাখাইয়া ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত গান করিতে লাগিলেন। সে গানে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, সভাজনের মনপ্রাণ গলিয়া গেল। আনন্দে-আনন্দে যেন সেই স্থানটা ছাইয়া ফেলিল। জগন্নাথের গান থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ সকলে যেন কেমন এক-তর হইয়া—বাক্যহীন স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। তাহার পর নরনাথ আপন অঙ্গের সকল অলঙ্কার খুলিয়া জগন্নাথদাসের পদপ্রান্তে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক জড়িতজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন—প্রভু! আমি আজি হইতে আপনার শরণাগত, আমায়

মনে রাখিবেন। পরে তিনি চন্দ্রার্ক-নামক স্থানে গৃহ-সহিত ভূসম্পত্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

জগন্নাথদাস হরিগুণ গান করিতে-করিতে চলিয়া গেলেন। এদিকে মহারাজ সেই দুষ্টবুদ্ধি সাধুনিন্দক খলের দলকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাহাদের কাহাকে 'চাঙ্গে' চাপাইয়া (উচ্চমঞ্চ হইতে অস্ত্রের উপর ফেলিয়া দিয়া*), কাহাকে চাবুক-পেটা কাহাকে বা লাঠিপেটা করাইয়া রাজ্যের বাহির করাইয়া দিলেন। আর ঘোষণা করাইলেন যে, আজ হইতে আমার রাজ্যে যে কেহ সাধুর নিন্দা বা সাধুর দ্রোহ আচরণ করিবে, আমি তাহাকে সবংশে বিনাশ করিব।

প্রায় চারিশত বৎসর হইয়া গেল, জগন্নাথদাস নশ্বর শরীর ছাড়িয়া শাশ্বত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজিও ৺পুরী-ধামে সমুদ্রকূলে শ্রীলহরিদাসঠাকুরের সমাধির অনতিদূরে তাঁহার সমাধিমন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। আজিও তাঁহার ভাষা-ভাগবত উৎকলবাসীর গৃহেগৃহে গৃহদেবতার মত পূজিত, ইষ্টমন্ত্রের মত নিত্য আবর্ত্তিত—পঠিত, মুখেমুখে আলোচিত ও উদ্গীত হইতেছে। এই ভাষাভাগবত উৎকলদেশে উৎকল-লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে; মেদিনীপুরজেলায় কাঁথি হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। এ ভাগবতের আদর দেশে-দেশে।

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৯ম-পরিচ্ছেদে এই চাঙ্গে-চাপানোর উল্লেখ আছে। যথা,—"একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল। গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চঢ়াইল ॥ তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারি দিবে। প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে ॥"

জগন্নাথদাসের সম্প্রদায়—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় 'অতিবড়ী-সম্প্রদায়' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভক্ত হইবেন—বিনয়ের খনি, দীনতার অবতার। ভক্ত প্রভুদত্ত শক্তিতে সর্ব্বসমর্থ হইলেও সে শক্তি গোপনে-গোপনেই রাখিবেন; কাহারও কাছে প্রচার করিবেন না। কেননা, তাহা প্রচার হইয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ! প্রতিষ্ঠার দায়ে তখন তিষ্ঠানো ভার; অভিমান আসিয়া গেলে তো আরও অধিক সর্ব্বনাশ। তাই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য যখন রেমুণার শ্রীগোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেন, তখন তিনি সেস্থান হইতে রাতারাতি পলাইয়া গিয়াছিলেন। পাছে কেউ টের পায়। জগন্নাথদাস কিন্তু রাজসভায় আপনার বড়াই দেখাইয়া আপনাকে জাহির করিয়াছিলেন। তাই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজে তিনি বা তাঁহার সম্প্রদায় 'অতিবড়ী' বলিয়া পরিচিত, কিছু অনাদৃতও বটেন।* ৺পুরীধামের উৎকলমঠ বা উড়িয়ামঠ এই অতিবড়ীসম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। এই মঠের 'তোড়ানী' (আমানি) সে দেশে দুরারোগ্য রোগনাশের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রবাদ,—অন্যূন আড়াই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই 'তোড়ানী' অতি যত্নে ও অতি পবিত্রভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

---

* কেহ কেহ বলেন,—"তিলকসেবাবিষয়ে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সহিত ইঁহার বাদানুবাদ হয়, তিনি প্রভুর মতে সম্মত হন নাই, এই জন্য প্রভু বলিয়াছিলেন,—তুমি অহঙ্কার পরবশ হইয়া আমার মতের অন্যথা করিলে, তুমি বড় লোক, ইত্যাদি। এই নিমিত্ত ঐ সম্প্রদায় 'অতিবড়ী' বলিয়া বিখ্যাত হন।" এই মত ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন।

গঙ্গাধর দাস।

"না না, আমি আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না, দেখাইব না।"

"কেন, কেন,—কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে ?"

"হবে আর কি ? আমি অভাগিনী, আমার মুখ কাহারও দেখিয়া কাজ নাই।"

"সুন্দরি! আজ আমার প্রতি অকারণ এ অকরুণ সম্ভাষণ কেন ?"

"অকারণ আবার কি ?"

"কারণ থাকিলেও আমার তাহা জানা নাই। শুনিতে পাই না কি ?"

"জানা থাকিবে না কেন ? ব'লে ব'লে আমার মুখ যে ভোঁতা হ'য়ে গেছে।"

"ভাল, আর একবার না হয় ব'ল্লে। সত্য বলিতেছি সতি, আমার কিছুই মনে পড়ে না।"

"না, আমি আর বলিতেও চাই না, মুখ দেখাইতেও চাই না।"

এই বলিয়া শ্রী ভাল করিয়া মুড়ি-সুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কেবল বলিল,—হুঁঃ, আমার কথা মনে পড়িবে কেন ?

পত্নীর অবস্থা দেখিয়া গঙ্গাধর বড় চিন্তাতেই পড়িয়া গেল। আহা, বেচারি সারাদিন খাটাখাটুনীর পর পতিব্রতার দুইটা মধু-মাখা কথা শুনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা করিতে আসিয়াছিল, ভাগ্য-দোষে আজ তাহার—"অমৃত গরল ভেল"—অমৃত গরল হইয়া গেল!

গঙ্গাধর গরীব গৃহস্থ। জাতিতে বেণিয়া। শুঁট পিপুল প্রভৃতি কটু দ্রব্য ফিরি করিয়া বিক্রয় করাই তাহার বৃত্তি। সংসারে এক পত্নী ছাড়া কেহই নাই। পুত্র কন্যা হয় নাই, হইবার বয়সও নাই। তজ্জন্য তাহারা তত ভাবে না। ভাবে কেবল ভাবে-ভাবে ভগবান্‌কে। পতিপত্নী উভয়েরই উভয়ে সমান প্রীতি—উভয়েরই উভয়ে আজ্ঞানুবর্ত্তী। সুতরাং গরীব হইলেও সুখেরই সংসার। সে সংসারে অতিথিসেবা আছে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া আছে, বিপন্নকে যথাসাধ্য সাহায্য করাও আছে। আজ সেই সুখময় শান্তিময় সংসারে সহসা বচসার ভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল,—সুধা-ঢলঢল সুধাকরের মধ্যভাগে কালকূটের কালান্তক কটুতা কি করিয়া প্রবিষ্ট হইল, ভাবিয়া গঙ্গাধর বড় অধীর হইয়া উঠিল।

গঙ্গাধর কি করে, সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, কে বা কাহারা তাহার পত্নীর অন্তরে দারুণ ব্যথা দান করিয়াছে; এ কটূক্তি সেই ব্যথারই অভিব্যক্তি। নচেৎ স্বভাব-সরলা স্ত্রীর হৃদয়ে এ গরলভরা ভাব আসিবে কেন? গঙ্গাধর নানা অনুনয়ে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিল,—স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল যে, যদি সর্ব্বস্ব

যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি তোমার অন্তরের ব্যথা অন্তর্হিত করিবই করিব।

এইবার শ্রী পতিদেবতার পদতলে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—স্বামি গুরু দেবতা! এ অভাগিনীর অপরাধ লইও না। এ পাপীয়সীর তা'হ'লে আর নিস্তার নাই। নাথ! কত মহাপাতকের ফলে অপুত্রপ্রসবিনী রমণী হইতে হয়, জানি না। জানিলে সকলকে সাবধান করিয়া যাইতাম, সে মহাপাপ যেন কেহ না করে। হায় পতি! তুমিই সতীর একমাত্র গতি, দুঃখের কথা আর কাহাকে জানাইব, তোমাকেই জানাই,—আমার তো আর ঘাটে-বাটে যাওয়া ভার হ'য়ে প'ড়েছে। পথে আমায় যে দেখে, সে-ই মুখনাড়া দিয়া মুখ ফিরায়। কাছে কেহ দাঁড়ায়না; কেবলই বলে,—হায় হায়, ক'রলাম কি, সকালবেলায় আঁটকুড়ির মুখ দেখ্‌লাম, না জানি ভাগ্যে কি আছে? কেহ বা বলে,—আ মর্ আঁটকুড়ি, ভোর না হ'তে হ'তে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়েছে। কেহ কেহ বলে,—দে দে আঁটকুড়ির মুখ পুড়িয়ে; রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করে না? স্বামিন্! এইরূপ কত কথা যে কত লোকে বলে, তাহা আর কত বলিব? মনে বড় কষ্ট হয়,—আমি তো স্বপ্নেও কখনও কারুর অনিষ্ট চিন্তা করি নাই, উঁচু-গলা করিয়া কাহারও সহিত কথা কহি নাই, কেবল বিধাতা পুত্র-কন্যা দেন নাই বলিয়াই কি আমার এত অপরাধ এত অপমান? আজ আমায় গোয়ালাবৌ যে অপমানটা করিয়াছে, তাহা আর কি বলিব। প্রাতঃকালে আমি জল তুলিতে ঘাটে গিয়া-

ছিলাম, সে জ্বলন্ত আগুনের নুড়া লইয়া আমার পাছেপাছে তাড়া করিয়াছিল। আর তার গালাগালির বহরই বা দেখে কে? তা তুমি যদি এর একটা প্রতিকার কর ভালই, না হয় আমাকে অগত্যা আত্মহত্যাই করিতে হইবে দেখিতেছি।

গঙ্গাধর এতক্ষণে সকল রহস্য বুঝিতে পারিল। দুঃখে ক্ষোভে তাহারও হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস ত্যাগ করিয়া পত্নীকে বলিল,—সাধ্বি! এ অসাধ্য ব্যাধির প্রতিকার—বিধাতার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি আছে? যদি কিছু থাকে, বল, আমি এখনই তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। পতির সমবেদনায় পতিব্রতার হৃদয় গলিয়া গেল। শ্রী এইবার ধীরেধীরে উঠিয়া বসিল এবং স্বামীর করে ধরিয়া বলিতে লাগিল,—হৃদয়েশ্বর! ঈশ্বর যখন সন্তান দিলেন না, তখন আপন গর্ভে সন্তান-লাভের সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি এক কার্য্য করিতে পারো; হয় একটী ব্রাহ্মণপুত্রকে ভিক্ষাপুত্র করিয়া দাও, না হয় আমাদের কুলের কোন দরিদ্রের ঘর হইতে কিছু টাকা-কড়ি দিয়া একটি পুত্র ক্রয় করিয়া আনো, আমি তাহাকেই পুত্রের মত প্রতিপালন করিব। সেই অপত্যই আমার নরকপাত নিবারণ করিবে,—পরের অপবাদ হইতে আমায় মুক্ত করিয়া দিবে।

ভাল ভাল, তাহাই হইবে; পুত্র প্রতিপালন করিতে চাও তাহাই আনিয়া দিতেছি;—বলিয়া গঙ্গাধর কিছু টাকাকড়ি লইয়া বাটীর বাহির হইল। তাহার বাসস্থান গোবিন্দপুর হইতে নীলাচলধাম নিকটেই। সে চঞ্চলপদে সেই নীলাচলে চলিয়া গেল এবং

রূপকারের গৃহ হইতে একটী প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা ক্রয় করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। আসিয়া সানন্দ-সম্ভাষণে পত্নীকে বলিল,—সতি! এই নাও তোমার প্রার্থিত সামগ্রী গ্রহণ কর।—

"এহিটি গতি-মুক্তি-দাতা। এহিটি জীবর করতা॥
এহাঙ্কু পুত্রবুদ্ধি করি। যশোদা দেবী গলে তরি॥
ব্রহ্মাদি সর্ব্ব দেবগণে। এহাঙ্কু ভাবু থান্তি মনে॥
এ প্রভু বিনা অন্য জনে। নাহিঁ জীবর উদ্ধারণে॥
এণু কেবল হৃদগতে। বিশ্বাসে সেব একচিত্তে॥
যাহা বাঞ্ছিব তোর মন। তাহা করিবে এহি পূর্ণ॥"

এইটিই গতি-মুক্তির দাতা। এইটিই সকল জীবের কর্ত্তা। ইঁহাকে পুত্রবুদ্ধি করিয়া যশোদাদেবী তরিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মা-আদি দেবগণ মনেমনে ইঁহাকেই ভাবিয়া থাকেন। এই প্রভু ছাড়া জীব উদ্ধার করিবার আর অন্য কেহ নাই। তুমি সরল বিশ্বাসের সহিত একমনে একপ্রাণে ইঁহাকে সেবা কর, তোমার মন যখন যাহা চাহিবে এই পুত্রই তোমার তাহা পূর্ণ করিয়া দিবে।

যেমন স্বামী, স্ত্রীও তেমনি। দুই জনের দুইটি দেহ হইলে কি হয়, হৃদয় যে একটি। গঙ্গাধরের যে হৃদয় অন্য নশ্বর পুত্র না আনিয়া কৃষ্ণপ্রতিমাকে পুত্ররূপে আনাইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাঙ্গহরা শ্রীর হৃদয় তো সেই হৃদয়েরই আধখানা! তাই, এই কৃষ্ণপ্রতিমা পাইয়া শ্রীর একবারও মনে হইল না যে, এটি একটি সামান্য প্রতিমা মাত্র। শ্রী সেই ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতিগঞ্জন খঞ্জননয়ন কৃষ্ণধনকে ধাইয়া গিয়া প্রসারিত-হস্তে বক্ষে তুলিয়া লইল। প্রেমাশ্রুর পূতপ্রবাহে

তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে-করিতে বদনে ঘনঘন চুম্বন করিল। বারবার বক্ষে চাপিয়া-চাপিয়া ধরিল। পরে বাষ্পগদ্গদ-রুদ্ধ-স্বরে বলিল,—বাপ্‌রে গোপাল, তুই কি আমায় মা বলিয়া ডাকিবি? বাপ্‌রে নীলমণি, তুই কি অভাগিনীর অপবাদ মোচন করিবি? বাপ্‌রে, বাপ্‌রে আমার, তুই কি কাঙ্গালের এই আঁধার ঘরের উজল-আলো কালো-মাণিক হইয়া রহিবি?

পতিপত্নীর কৃষ্ণপ্রতিমাতেই পুত্রের নেশা জমিয়া গেল। জমাইতে বড় বিলম্বও হইল না। হইবেই বা কেন, যিনি এই নশ্বর মনুষ্য-বিগ্রহে পুত্রত্বের আরোপ করাইয়া মানবকে মমতাবিহ্বল করিয়া দেন, এক্ষেত্রে আপনি তিনিই যে পুত্রপ্রীতির ভিখারী;—গঙ্গাধর এবং শ্রীর বিশুদ্ধ ভক্তির আকর্ষণে তিনিই যে আজ প্রতিমারূপে আপনি আসিয়া উপস্থিত! শ্রী তখন করিল কি;—বিশ্বমোহনকে বক্ষ হইতে নামাইল। স্নান করাইয়া, গা পুঁছাইয়া, দিব্য আসনে বসাইল। উত্তম ক্ষীর সর নবনীত ভোজন করাইল। তাহার অশান্ত প্রাণ আশ্রয় না পাইয়া এতদিন কেবল শূন্যেশূন্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, আজ উপযুক্ত আশ্রয় পাইয়া সে শান্ত হইল। শ্রীর আর আজ আনন্দ ধরে না, পত্নীর আনন্দে গঙ্গাধরও আজ আনন্দে অধীর।

এইরূপে কিছু দিন যায়। বণিক্‌দম্পতী কায়মনোবাক্যে সেই কৃষ্ণপ্রতিমার সেবা করিতে লাগিল। এ প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য পুরোহিতের মন্ত্র-আবৃত্তির প্রয়োজন হইল না, উভয়ের প্রাণঢালা অনুরাগেই তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। এ প্রতিমা সতত

সজীব। সাধক যাহা বলে, তাহা শুনে। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি আজ বণিক্‌দম্পতীরই একান্ত অনুরক্ত, তাহাদেরই ক্রীড়া-পুত্তলিকা। বিশুদ্ধভাবের এমনই প্রভাব বটে!

পতি-পত্নী পুত্রের মত সেই প্রতিমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। তৈল-কুঙ্কুম মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়, অঙ্গে কর্পূর-চন্দন লেপন করে, সুদৃশ্য সুবাসিত কুসুমের বেশ করিয়া দেয়, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে, ললাটে চিত্রবিচিত্র তিলক পরাইয়া দেয়, আরও কত কি শোভন সাজে সজ্জিত করে। বালকের স্বভাব—ফল বড় ভাল বাসে। কুল, কয়েতবেল, কলা, কাঁঠাল প্রভৃতি একবার গ্রামে বেচিতে আসিলে হয়, শ্রী কিংবা গঙ্গাধর যাহার নজরে পড়ে, সে তাহা গোপালের জন্য কিনিবেই কিনিবে ; তা তাহার মূল্য যতই লাগুক। গঙ্গাধর যখন কোন বিদেশে ব্যাপার করিতে যায়, সেখানে যাহা-কিছু উত্তম খাদ্যদ্রব্য মিলে, তাহা কিনিয়া আনে। আনিয়াই গোপালের হাতে দেয়। তাহাতেই তাহাদের মহা সুখ। গোপালকে সমর্পণ না করিয়া তাহারা কিছুই উদরস্থ করে না। শ্রীর আবার অনুরাগ আরও অধিক। সে নয়নে-নয়নে গোপালকে রাখিয়াও যেন সদাই হারাইয়া-হারাইয়া ফেলিতেছে গৃহকৃত্য আর তাহার ভাল লাগে না। দৈবাৎ কার্য্যান্তরে যাইতে হইলে দণ্ডে দশবার ফিরিয়া আসে। একটু অধিক বিলম্ব হইয়া গেলে তো আর রক্ষা নাই ; হন্ হন্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোপালকে বক্ষে লইয়া চন্দ্রবদনে ঘনঘন চুম্বন করে, আর আপনাকে আপনি গালি পাড়ে। বলে,—আমার

মুখে আগুন, মুখে আগুন, আহা বাছাকে আমার একলা ফেলে আমি অলক্ষণী এতক্ষণ চোলে গিয়েছিলাম, আহা বাছার আমার না জানি কত কষ্টই হ'য়েছে!

গঙ্গাধরদাস গোপালপ্রতিমার প্রীতে পড়িয়া আর অধিক দূরদেশে ব্যাপার করিতে যাইতে পারে না। অথচ মাঝেমাঝে না যাইলেও চলে না। হয় তো যাইব-যাইব মনে করে, আজ যাইব কাল যাইব করিয়া আর যাওয়া হয় না। গোপালকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার প্রাণ যেন দেহবিচ্যুত হইয়া পড়ে, কাজেই যাওয়া হয় না। এবার সাময়িক সওদার খাতিরে তাহাকে সুদূর বিদেশে যাইতে হইতেছে। বিষম চিন্তা,—কি করে। পত্নীর করে ধরিয়া বলিয়া দিল,—আমার গোপাল রহিল, আর তুমি রহিলে; দেখো যেন তাহার কোন অযত্ন না হয়। তুমি সর্ব্বদা বাছার কাছেকাছে থাকিবে; একবারও চক্ষের আড় করিবে না। এইরূপ বলিয়া-কহিয়া গোপালের কাছে বিদায় লইয়া—কাঁদিতে-কাঁদিতে গঙ্গাধর বাটীর বাহির হইল। শ্রীও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আহারনিদ্রা ছাড়িয়া গোপাল-সাগরে নিমগ্ন রহিল।

বিদেশে গঙ্গাধরদাসের তিন দিন কাটিয়া গেল। বাপ, তিন দিন কি, এ যে অনন্ত কোটী কল্প!—এইরূপই তাহার মনে হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না, ব্যাপার করাও আর পোষাইল না; গোপালের নিমিত্ত ভালভাল খাবারদাবার কিনিয়া গৃহমুখে যাত্রা করিল। 'গোপাল গোপাল' করিয়াই পাগল, চোখে কিছু দেখিতে পায় না। কর্ণে কিছু শুনিতে পায় না।

কোথা দিয়া যাইতেছে, কেমন করিয়া যাইতেছে, কিছুই ঠিক নাই। কেবল বায়ুবেগে চলিয়াছে। পথক্লেশে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তবুও চলিয়াছে। মধ্যেমধ্যে কাষ্ঠপাষাণাদির আঘাত পাইয়া পড়িয়া যাইতেছে, শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, তবুও চলিতেছে। গোবিন্দপুরগ্রামের কাছাকাছি আসিয়া বৃদ্ধ গঙ্গাধর একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ঠোক্কর লাগিয়া পড়িয়া গেল। এই পড়াই তাহার শেষ-পড়া। আর তাহাকে উঠিতে হইল না। কৃষ্ণ রে—বাপ্ রে আমার, আর তোমায় দেখিতে পাইলাম না, বলিতে-বলিতে সে নয়ন নিমীলন করিল।

এদিকে গঙ্গাধরের গৃহিণী গোপালকে বুকে করিয়া শুইয়া আছে। কয়েক দিন নিদ্রা নাই, একটু তন্দ্রার আবেশ আসিয়াছে। হঠাৎ যেন তাহার মনে হইল,—কৃষ্ণধন আমার ক্রন্দন করিতেছে। সে অমনি "বাপ্! বাপ্!" করিয়া উঠিয়া পড়িল। কেন, কেন কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে, বলিয়া গোপালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এমন সময় কয়েকজন গ্রাম্য লোক আসিয়া তাহাকে বলিল,—ও বেণেবৌ! তোর কপাল ভেঙ্গেছে লো কপাল ভেঙ্গেছে; ঐ গ্রামের বাহিরে গিয়ে দেখ্‌গে—তোর ভাতার ম'রে প'ড়ে আছে; আমরা এই স্বচক্ষে তাকে দেখে আস্‌ছি। শ্রী এই কথা শুনিয়া,—"অ্যাঁ বাবা গোপাল! ওরা বলে কি" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছাবসানে শ্রী উঠিয়া বসিল। একবার ভাবিল,—একি স্বপ্ন? এ ভাবনা তাহার অধিকক্ষণ তিষ্ঠিল না। আরও কতকগুলি

গ্রামবাসী আসিয়া তাহাকে তাহার পতির মৃত্যু-বার্ত্তা জানাইল। ভীতিভরে সতীর শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল,—চারিদিকটা যেন ঘুরিতেছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কোল হইতে গোপালকে নামাইয়া তাহার চরণতলে লুটাপুটি খাইতে লাগিল। সে কান্নার কথা কি বলিব, শ্রবণে বজ্রও বিদীর্ণ হয়। কান্নায় আর কোন কথা নাই,— কেবল হা গোপাল, যো গোপাল। হায় গোপাল, আমার কি করিলি? হায় গোপাল, তুই পিতৃহীন হইলি? হায় গোপাল, আমি এখন কি করি বল? হায় গোপাল, আমি তোরে ছাড়িয়াই বা কোথায় যাই? এইরূপ বিলাপবাণী এবং করুণ-ক্রন্দনে সে স্থানটা করুণরসের পরিস্ফুট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

ঐকান্তিক ভাবের কাছে ভগবান্ সর্ব্বদাই আত্মবিক্রয়ী। গোপাল আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্রীমুখে কথা ফুটিল। মাতৃ-প্রীতির অমৃতসিক্ত সুমধুর সম্ভাষণে তিনি বলিলেন,—ওমা, মাগো! তুই এত কাঁদিস্ কেন মা?—তুই এত ভাবিস্ কেন মা? তোর কান্না দেখে আমার যে বড় কান্না আসে মা! কাঁদিস নে মা, ভাবিস্ নে। বাবা তো মা! মরে নাই। বুড়ো মানুষ; পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। আমি ব'লছি, তুই যা; বাবাকে গিয়ে ব'লগে—"হ্যাগা তুমি তোমার একলা-ঘরের একটি ছেলে গোপালকে ফেলে এখানে শুয়ে র'য়েছ কেন? শীগ্গির এস গো শীগ্গির্ এস; গোপাল যে তোমার কেঁদে কুটিপাটি ক'র্‌ছে।" যা মা! যা; শীগ্গির্ বাবাকে সঙ্গে ক'রে

নিয়ে আয়, না হ'লে আমি কাঁদ্‌বো, খাওয়াদাওয়া কিছুই ক'রবো না।

সকল প্রীতির মূল প্রস্রবণ ভগবান্। অপরে প্রীতি তো তাঁহারই সম্বন্ধে। তাই পতিব্রতা শ্রী—পথিমধ্যে পতির প্রেত-শরীর পড়িয়া আছে, শুনিয়াও গোপালকে ছাড়িয়া এক-পা নড়িতে পারে নাই। কিন্তু সেই সকল-প্রীতির মূলাধার গোপালই যখন বলিতেছে,—মা! তুমি না গেলে আমি কাঁদবো, আহারাদি কিছু ক'রবো না; তখন আর কি সতী পতির কাছে না যাইয়া থাকিতে পারে? শ্রী গোপালের কথাতেই গোপালকে ছাড়িয়া পতির উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। গিয়া দেখিল,—স্বামী অজ্ঞান অচৈতন্য, শরীর শীতল; দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়া হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। আশানৈরাশ্যের আলোক-আঁধারে তাহার অন্তরে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তথাপি সে গোপালের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া পতির মস্তকে অতি সন্তর্পণে হস্তার্পণ করিল, শীতকাতর স্থবিরের মত অর্পিত কর থরথর কম্পিত হইতে থাকিল, কম্পিতকণ্ঠেই কহিল,—সতীর সর্ব্বস্বধন! ধূলায় অচেতন হইয়া পড়িয়া কেন? উঠ, নয়ন মেলিয়া দেখ, তোমার চরণসেবিকা শ্রী আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি। বাপ গোপাল আমার তোমার তরে কাঁদিয়া আকুল। আর বিলম্ব করিও না, চল—শীঘ্র চল, বাছা আমার একাকী গৃহে পড়িয়া আছে, আমিও এখানে একাকিনী অসহায়া আসিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গঙ্গাধর প্রাণ পাইল। সে যেন নিদ্রায়

অবসানে উঠিয়া বসিল। দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল। পার্শ্বে শ্রীকে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইল। পরক্ষণেই গোপালের কথা মনে পড়িয়া গেল। একা পত্নী এখানে, তবে কি গোপালের কোন অমঙ্গল হইয়াছে?—ভাবিয়া তাঁহার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—প্রাণ-সখি! তুমি এখানে, আর আমার বাছা গোপাল? এই বলিয়া গঙ্গাধর যেন মূৰ্চ্ছিত হয় হয় হইয়া পড়িল। পত্নী—'ভয় নাই ভয় নাই—গোপাল আমার কুশলে আছে'—বলিয়া পতিকে আশ্বস্ত করিল এবং একেএকে সকল কথা কহিয়া স্বামীকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে চলিতে-চলিতে দুজনার মুখে গোপালের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন কথাই নাই। শতমুখে গোপালের গুণ গাহিতে-গাহিতে উভয়ে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গঙ্গাধরদাস দ্বার হইতেই—বাবা গোপাল, গোপাল,—ডাক ছাড়িতে-ছাড়িতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বিদেশ হইতে যে সকল অপূৰ্ব্ব সামগ্রী গোপালের জন্য আনিয়াছিল, গঙ্গাধর সর্ব্বাগ্রে তাহা গোপালের সম্মুখে ধরিয়া দিল। তার পর কোলে তুলিয়া রাতুল অধরে চুম্বন আরম্ভ করিল। সে চুমা-খাওয়া আর ফুরায় না। শ্রীও চুপ করিয়া রহিল না, সে-ও যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গহরার মত পতির এই আনন্দে অর্দ্ধেক ভাগ বসাইল। সে একবার পতির কোল হইতে গোপালকে কোলে লইয়া ঘনঘন চুমা খায়, পতিও আবার তাহার কোল হইতে গোপালকে কোলে লইয়া চুমা খায়। দীর্ঘ-

কাল এইরূপ কাড়াকাড়ি করিয়া চুমা-খাওয়াই চলিতে লাগিল। সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে? পতি-পত্নী আজ কয়দিনের ক্ষুধা-পিপাসা এক চুম্বনেই পূরণ করিয়া লইল। রোগ-শোক-সমাকীর্ণ—স্বার্থের সংঘর্ষে সতত সমুদ্বিগ্ন সংসারের তো নয়, এ আনন্দ বুঝি আর কোন্ দেশের,—আর কোন্ আনন্দসাম্রাজ্যের? এই অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্রে পতিপত্নী পরমানন্দে সন্তরণ করিতে লাগিল।

এইরূপ আনন্দেআনন্দে দিবসের অবসান হইয়া গেল। রাত্রিকাল। শয়নের সময় গঙ্গাধর তাহার গোপালকে বলিল,—কৃষ্ণ হে! শুনিতে পাই, তুমি নাকি কমলার পতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, সকল জীবের কর্ত্তা এবং চতুর্ব্বর্গফলদাতা? বাবা, তুমি যখন আমার তনয়, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে আমার এত ক্লেশ কেন? দেখ বৎস! পোড়া পেটের দায়ে পয়সা পয়সা করিয়া প্রত্যহই আমাকে দেশেদেশে ভ্রমিয়া বেড়াইতে হয়। দুঃখের কথা বলিব কি বাবা, উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলে, একদিন আহা বলিবারও আমাদের কেহই নাই। হাঁ বাপ, এ বৃদ্ধের দুঃখ কি ঘুচিবে না? এইরূপ বলিতে-বলিতে গঙ্গাধর ঘুমাইয়া পড়িল। সে স্বপ্নে দেখে,—তাহার মুরলীধর আসিয়া—হাসিতে-হাসিতে বলিতেছে,—বাবা বাবা! আমি যার পুত্র, তার আবার দুঃখ কিসের বাবা? তুমি যখন যাহা চাহিবে, তখনই তাহা পাইবে। এই দেখ বাবা, ধনরত্নে তোমার গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। আর তোমার ভয় কিসের, চিন্তা কিসের?

যে ভগবান্‌কে চাহে, আবার বিষয় প্রার্থনাও করে, তাহার মত মূর্খ জগতে আর নাই। মূর্খ গঙ্গাধর গোপালের কাছে বিষয় মাগিয়া গোপালকে হারাইয়া ফেলিল। হায়, হায়, লোভে পোড়ে হতভাগ্য লাভে-মূলে সকলই খোয়াইল। তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবা মাত্রই সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চারিদিকে চাহিয়া দেখে,—ঘরদ্বার ধনরত্নে ভরিয়া গিয়াছে! কৃতজ্ঞতায় তাহার অন্তর পূরিয়া উঠিল। গোপালের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া দেখে, গোপাল নাই। হায় কি সর্ব্বনাশ, বলিয়া বৃদ্ধ আছাড় খাইয়া পড়িল। উচ্চ চীৎকারে শ্রীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাস্তিমিত-নয়নে সে 'কি কি?' বলিতে-বলিতে সেখানে আসিয়া পড়িল। ব্যাপার বুঝিতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না; পতির আর্ত্তির মুখেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া গেল। শ্রীও মস্তকে করাঘাত করিতে-করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গঙ্গাধর আর গোপালের বিরহ-বেগ সহ্য করিতে পারিল না। হায় গোপাল, কোথা গেলে গোপাল, আমায় সঙ্গে ল'য়ে চল গোপাল, আর আমি ধন চাহিব না গোপাল, বলিতে-বলিতে তাহার কথা-বলা চিরতরে ফুরাইয়া গেল।

শ্রীর সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ। পুত্র অন্তর্হিত, পতি পর-লোকগত। হা [illegible] াল! এ আবার তোমার কি লীলা, বলিয়া পতিব্রতা পতির মস্তক কোলে তুলিয়া লইল এবং মর্ম্ম-নিকৃন্তন করুণ বিলাপে বজ্র-পাষাণকেও বিগলিত করিতে লাগিল। আহা, তাহার ব্যথা যে বিষম ব্যথা। পুত্রহীন দরিদ্র গৃহস্থ, অন্তরে আনন্দ ছিল না—ছিলই না। তাহার পর যদি আনন্দ আসিল

তো একবারে বরষার বন্যার মত হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া। তাহাদের কপালে এত আনন্দ সহিবে কেন? আলেয়ার আলোর মত সেই আনন্দ ক্ষণিক দীপ্তি দেখাইয়া অমিত অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল। পতি-পুত্র-হীনা শ্রী এ বেদনা আর সহিতে পারিল না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তখন তাহার কাণেকাণে যাহা বলিল, সে তাহাই অনুষ্ঠান করিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র সে ব্রাহ্মণ-সজ্জন অতিথি-ফকির দীন-দরিদ্র ডাকিয়া সমস্ত ধনরত্ন দুই হস্তে বিতরণ করিয়া ফেলিল। পতির দেহ মহা সমারোহে গ্রাম-প্রান্তে লইয়া গেল। চন্দনের চিতা প্রস্তুত করিল। তাহাতে গব্যঘৃত সমর্পিত হইল। যথাবিধি অগ্নি-সংযোগে চিতা দাউদাউ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নির নিকটে যায় কাহার সাধ্য? শ্রী এইবার স্নান করিয়া বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইল। তাহার পর পতিকে লইয়া হরিহরিধ্বনি করিতে-করিতে সেই জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারি-দিকে অসংখ্য দর্শক, তাহাদের বদনেও উচ্চ হরিহরি-নিনাদ। হরিহরিধ্বনি ভিন্ন অন্য শব্দ আর সেখানে নাই। সেই শব্দ ভেদ করিয়া শ্রীর অন্তিম প্রার্থনার বাণী সমুচ্চারিত হইল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া সেই কথা শুনিতে লাগিল। কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রী বলিল,—ওহে অগ্নিদেব! তোমায় নমস্কার। ওহে চন্দ্র সূর্য্য! তোমাদের নমস্কার। ওহে পৃথিবি! তোমাকে নমস্কার। ওহে ইন্দ্রদেব! তোমায় নমস্কার। ওহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর হরি-হর-বিরিঞ্চি! তোমাদের নমস্কার। আমি তোমাদের শরণাগত। আমি

আমার স্বামীর সঙ্গে যাইতে চাই। তাঁহার সহিত অনলমধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে চাই। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আত্মহত্যা-দোষে আমায় লিপ্ত হইতে না হয়। এই বলিয়া সতী বিদায়ের ভঙ্গীতে সকলের কাছে চিরবিদায় লইয়া হাসিহাসিমুখে পতির সহিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিল। দেখিতে-দেখিতে সকলই ফুরাইল। দর্শকের দল হরিহরিনাদে বিশ্বব্যোম পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

গঙ্গাধরদাস ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভক্ত। তাহার সহধর্ম্মিণীও তা-ই। তাহাদের প্রীতির আকর্ষণে বৈকুণ্ঠধাম হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সেখানে আসিলেন। তাহারা নয়নেনয়নে তাহা দেখিল। অনল-কুণ্ডই তাহাদের তুষার-চন্দন-শীতল সুধাকুণ্ড হইয়া উঠিল। সতী-শিরোমণি লক্ষ্মীদেবী শ্রীকে এবং সতীনাথ নারায়ণ সতীপতি গঙ্গা-ধরকে কোলে করিয়া দিব্যরথে আরোহণ করাইলেন। দেখিতে-দেখিতে দিব্য রথ আকাশমার্গ অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল। সকলে দেখিল,—বিদ্যুতের মত কি একটা চিতা হইতে উঠিয়া আকাশে মিশিয়া গেল। তাহারা সমস্বরে সতীর জয়জয় দিয়া উঠিল এবং অন্তরেঅন্তরে সতীর পবিত্র প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সতীর কথা সতীর ভাব কহিতে-কহিতে ভাবিতে-ভাবিতে আপন-আপন ভবনে গমন করিল। সতীর সতীত্বের পাবিত্র্যসৌরভে চারিদিক ভর্‌ভর্‌ ভরিয়া গেল!

মণি দাস।

মাল্যকার মণিদাসের নিবাস নীলাচলে। সে জাতীয় বৃত্তি দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। অনেকগুলি পরিবার। তাহার উপর অতিথি-অভ্যাগত আছে। সুতরাং সংসার বড় স্বচ্ছল ছিল না। সামান্য ফুলের মালা বেচিয়া আর কত পয়সা রোজগার হইবে? মণিদাসের মনটা কিন্তু রাজারাজড়ার চেয়েও দরাজ। খরচের ভয় করিত না। রোজগারপাতি যত হউক আর না-ই হউক, যোগেযাগে দিনটা কাটিয়া গেলেই হইল। ভবিষ্যতের চিন্তা সে ভগবানের উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। তাই প্রাণে আনন্দেরও অভাব হইত না।

বিধাতার কি যে নির্ব্বন্ধ বলা যায় না, মণিদাসের সংসারবন্ধনগুলি একেএকে শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি একেএকে পরলোকে চলিয়া গেল। সংসারে আসক্তি তো একে ছিলই না, তাহার উপর যাহাদের লইয়া সংসার, তাহারা সকলে চলিয়া যাওয়ায়, তাহার আসক্তির মূলটুকু পর্য্যন্ত মরিয়া গেল। বৈরাগ্যের বিমল আলোকে তাহার অন্তঃকরণ আলোকিত হইয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল,—ওঃ, কি যেন একটা ভারী বোঝা আমার মাথা হইতে নামিয়া গিয়াছে। যেখানে যাইতে চাই, কি যেন একটা কঠিন বাঁধনে টানিয়া-টানিয়া রাখিত; সেটা যেন কাটিয়া গিয়াছে। এখন এই বাঁধন-কাটা

হাল্কা শরীরে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি। হে নীলাচল-নাথ! ধন্য তোমার করুণা। সংসারের দাসত্ব-মুক্ত আমি আজ প্রাণ ভরিয়া তোমার দাসত্ব করিতে পারিব। হায় প্রভু, এতদিন আমি কা'দের দাসত্ব করিতেছিলাম?—স্ত্রী-পুত্রা-দির? এই তো তা'দের ব্যবহার? তাহাদের বিনা-বেতনের নিত্য-কিঙ্কর আমাকে তাহারা একটীও আশার কথা না বলিয়া যে যেখানে সরিয়া পড়িল। এমন নির্ম্মম নিষ্ঠুর মনিবের দাসত্ব কখনও করিতে আছে কি? কিন্তু হায় প্রভু, এমনই মোহ-মদিরার অদ্ভুত মাদকতা যে, আমরা নেশার বশে প্রেমময় আনন্দ-ময় দয়াময় তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া সেই স্ত্রী-পুত্রাদিরই দাসত্ব করিতে যাই। ফলও সেইরূপ হয়। তোমার দাসত্ব ছাড়িয়া সংসারের দাসত্বে প্রবৃত্ত হইলেই মায়া-পিশাচী অমনই আসিয়া গলায় ত্রিগুণ-রজ্জুতে বন্ধন করে, আর নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিতে থাকে। করুণাময়! তোমার করুণা-প্রভাবেই আমি আজ সংসার-দাসত্বে অব্যাহতি পাইয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন সাধ করিয়া সে দাসত্ব অঙ্গীকার না করি। চিরদিনই যেন তোমার দাস হইয়া, তোমার ভুবন-মঙ্গল নাম অবলম্বন করিয়া, নাচিয়া-গাহিয়া বেড়াইতে পারি।

মণিদাসের কথা কেবল কথাতেই পর্য্যবসিত হইল না। সে দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, এই সংসারের কেহই কাহার নহে। এখানকার প্রীতি-মমতা সকলই মিথ্যা। এই অসার সংসারে সার হইতেছে—একমাত্র ভগবানের নাম। মণিদাস কায়মনো-

ধাক্যে ভগবানের সেই নামই আশ্রয় করিল। বিষয়-বৈভব বিলাইয়া দিয়া ডোর-কৌপীন ধারণ করিল এবং হরিভজন করিয়া দিবা-যামিনী যাপন করিতে লাগিল। এখন আর সে রাতি পোহাইতে-না-পোহাইতে বাগানেবাগানে ফুল তুলিয়া বেড়ায় না। পয়সার আশা করিয়া ফুলের মালা গাঁথে না। আর সেই মালা বেচিবার জন্য নগরেনগরে ঘোরাঘুরি করে না। সে এখন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করে। দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করে। কণ্ঠে তুলসীর মালা; কটিতে কৌপীন; হস্তে দুইটা নারিকেলমালার কর-তাল; এই অবস্থায় সে জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া পতিত-পাবনদেবের সম্মুখে বাহির হইতেই কিছুক্ষণ নৃত্য-গীত ও দণ্ডবৎ প্রণাম করে। তাহার পর সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়া বরাবর শ্রীজগমোহনে চলিয়া যায়। গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করে। বারংবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে। উঠিয়া কপালে কৃতাঞ্জলি করযুগল রাখিয়া গদগদ-স্বরে বলে,—প্রভু হে! তোমার করুণার বলিহারী যাই, বলিহারী যাই। আমি যেন তোমার ওই চন্দ্রবদন চাহিতে-চাহিতে তোমার বালাই লইয়া মরিতে পারি। হায় প্রভু, তুমিই আমার জীবনের জীবন—তুমিই আমার কাঙ্গালের রতন। তুমি বই আমার কেউ নাই কেউ নাই,—কেউ থাকিয়াও কাজ নাই কাজ নাই। তুমিই আমার—আমার আমার, আমার তুমি—তুমিই আমার।

ভক্ত মণিদাস গরুড়ের পাছে রহিয়া পিপাসিত-নয়নে চাহিয়া-চাহিয়া প্রাণ-বঁধুর বদন সুধা পিয়িয়া-পিয়িয়া ভাবের নেশা জমাইয়া লয়। আর উচ্ছ্বাসময় ভাবের গান গাহিতে-গাহিতে নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া মস্তক হেলাইয়া মহা নৃত্য জুড়িয়া দেয়। সে জগমোহনের শেষ সীমা—যেখানে চন্দনকাষ্ঠের অর্গল আছে, সেই পর্য্যন্ত একবার নাচিতে-নাচিতে গমন করে; আবার গরুড়স্তম্ভ পর্য্যন্ত পাছু হাঁটিয়া নাচিতে-নাচিতে আসিতে থাকে। নয়ন আর কোন দিকে নাই, সে সেই ভাবনিধি ভগবানেই তন্ময় হইয়া আছে। এইরূপ নাচিতে-নাচিতে সে ভাবেভাবে অধীর হইয়া পড়ে। কখনও কম্প, কখনও ঘর্ম্ম, কখনও অশ্রু, কখনও পুলক, কখনও স্বরভেদ, কখনও বৈবর্ণ প্রভৃতি ভাব-ভূষণে ভূষিত ভক্ত মণিদাসের সে এক ভঙ্গীই স্বতন্ত্র। মণিদাস এইরূপ নাচিতে-নাচিতে কখনও উচ্চৈঃস্বরে জয়জয়-কার দিয়া উঠে। কখনও দু'বাহু তুলিয়া ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়ে। কখনও বা দুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া স্তবস্তুতি করিতে থাকে। সে ভাবভোলে বলে,—ওহে ও কাল-বরণ! তোমার জয় হউক। ওহে ও গুঞ্জা-বিভূষণ! তোমার জয় হউক, জয় হউক। বনমালি হে! তোমার গলায় নানা ফুলের মালা দোলে। আহা, সে শোভা দেখিলে মন-প্রাণ ভুলে যায় গো ভুলে যায়। তোমার কমলার লীলাভূমি বক্ষঃস্থলে কমল-মালা দোদুল্যমান। অঙ্গেঅঙ্গে রত্নের অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। শ্রবণে মকর-কুণ্ডল, যেন দুইটী রবিমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে গণ্ডস্থল উজ্জ্বল করিতেছে। মাথায়

রত্নমুকুট, আহা যেন নবগ্রহের পংক্তি। তোমার সুধাংশুবদন দেখিলে ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তোমার ওই প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম-সদৃশ সুন্দর নয়নযুগল যেন তোমার দাসের দুঃখসাগরের পারে যাইবার ভেলার মত শোভা পাইতেছে। তোমার ওই শ্রীহস্ত দুইটি যেন জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যই অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে আবার কি বিচিত্র শঙ্খ-চক্র, দেখিলে আর নয়ন ফিরাইতে সাধ হয় না। তোমার ওই ভক্ত-রক্ষায় ব্যগ্র সুদর্শনচক্র-শোভিত শ্রীকরের উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর কি কাহাকেও ভীত-চকিত হইতে হয়? হে প্রভু, তোমার অভয় পাদপদ্ম শরণাগতের সর্ব্বভয় নিবারণ করিয়া থাকে। তোমার ওই চরণ-কমল ছাড়া আমার আর অন্য শরণ অন্য ভরসা কিছুই নাই। হে সর্ব্ব-মনোহর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রভু! আমি তোমার সর্ব্বভাবে শরণাগত। তোমার দাসত্বে যেন কখনও বঞ্চিত হইতে না হয়।

এইরূপ বলিতে-বলিতে মণিদাস উন্মত্তের মত নৃত্য করিতে থাকে। তাহার পদতালে মেদিনীমণ্ডল টলটল কাঁপিতে থাকে। নারিকেলমালার করতালের ধ্বনি ও বিবিধ বিকৃত-কণ্ঠস্বরে সেই স্থানটা পরিপূরিত হইতে থাকে। আর তার মুখ দিয়া শুভ্র ফেনা গড়াইয়া-গড়াইয়া পড়িতে থাকে। তাহার ভঙ্গী দেখিলে কেবলই মনে হয়,—সে যেন ভাব-বারিধি ভগবানের একটী ভাব-তরঙ্গ—বারবার নানা রঙ্গের অবতারণা করিয়া নাচিতে-গাহিতে আসিতেছে ও যাইতেছে। আর তার ফেনোদ্গম-

সহকৃত গম্ভীর গর্জ্জনে সমগ্র জগমোহন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মণিদাস প্রতিদিনই শ্রীজগমোহনে এইরূপ নাচিয়া-গাহিয়া শ্রীজগন্নাথের আনন্দ সম্পাদন করিয়া থাকে। আপনার মনেই যায়, আপনার মনেই গায়, আপনার মনেই নাচে, আপনার মনেই চলিয়া আসে। কেহ কিছু মহাপ্রসাদ দিল তো খাইল, নচেৎ কোন মঠে আসিয়া পড়িয়া রহিল। আবার খেয়াল হইল তো শ্রীজগমোহনে আসিয়া নাচনা-গাহনা জুড়িয়া দিল। ফলে সে তাহার এই কৃষ্ণদাসত্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সংসারের দাসত্বে কিন্তু এমনটী ছিল না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন হইল কি, শ্রীজগবন্ধুর জগমোহনে পুরাণপণ্ডা (পুরাণপাঠক) বসিয়া পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেক লোক শ্রবণ করিতেছেন। পণ্ডাঠাকুর ব্যাখ্যাচাতুর্য্যে সকলেরই মন অপহরণ করিতেছেন। এমন সময়ে ভক্ত মণিদাস সেই নারিকেলমালার করতাল বাজাইতে-বাজাইতে উচ্চস্বরে 'রামকৃষ্ণহরি-নাম' গাহিতে-গাহিতে জগমোহনে আসিয়া প্রবেশ করিল। শ্রীদারুব্রহ্মকে দর্শন করিয়া তাহার আর উল্লাসের সীমা-পরিসীমা রহিল না। সে আনন্দভরে উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়িয়া দিল। নাচিতে-নাচিতে পুরাণপণ্ডার নিকটে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল এবং পাগোলের মত আবোল-তাবোল কত কি বকিতে থাকিল। তাহার তো আর পুরাণ-পণ্ডা বলিয়া ভয় নাই, সংজ্ঞাও নাই। ভয়ের ভয়—ভয়হারীর অভয়-পদে, তাহার যে মনের লয় হইয়া গিয়াছে। পুরাণপণ্ডা কিন্তু

মণিদাসের এই ব্যবহারে ভীষণ চটিয়া গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পুঁথিখানি বাঁধিয়া ফেলিলেন। মহা হাঁক-ডাক জুড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—আরে রে মূর্খ, এই বিষ্ণুপুরাণ-পুঁথি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ; তুই কিনা সেই পুঁথির কাছে ঠ্যাং তুলিয়া নাচিতেছিস্? তোকে কেউ কিছু বলে না ব'লে,—না? যত ভাল-ভাল লোক এখানে ব'সে র'য়েছেন, দেখতে যেন দেবতার মত শোভা হ'য়েছে, তোর সেদিকে একটুও দৃষ্টি নাই; তুই কিনা গরবভরে পায়ে ঘুমুর বেঁধে নৃত্য জুড়ে দিয়েছিস্,—এখানে প'ড়ে-প'ড়ে আবোল-তাবোল ব'কে ম'চ্ছিস্? পুরাণ শুনতে তোর কাণে কি হ'য়েছিল? পুরাণপণ্ডা কোপভরে এইরূপ কত কি বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। মণিদাসের কর্ণে তাঁহার একটি কথাও প্রবেশ করিল না। সে যে তখন তাহার প্রভুকে লইয়া আপনাহারা হইয়া আছে। সুতরাং তাহার গলা-বাজি বা গড়াগড়ি কিছুই থামিল না,—সমভাবেই চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রোতার ভিতর আর পাঁচজনেরও বেজায় রাগ হইল। তাহারা একজোটে আসিয়া মণিদাসকে আক্রমণ করিল। সে চীৎকার-চেঁচামেচির চোটটাই বা কত। তাহারা ধাক্কার উপর ধাক্কা দিয়া মণিদাসকে বলিতে লাগিল,—আরে রে আহম্মক, পুরাণপণ্ডা ব'লে তোর একটুও প্রাণে ভয় নাই? উনি কি একটা যে সে লোক? রোস্, তাঁর কথা না শোনার ফলটা তোকে ভাল ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোর কোন্ বাপ এসে তোকে রক্ষা করে একবার দেখে নিই। আরে রে ভণ্ড, এখনও

ব'লছি, তুই এখান হ'তে ভালয়-ভালয় এখনই চম্পট দে, না হ'লে ভাল ক'রে টেরটা পাইয়ে দেবো,—এখানে এসে নাচুনী-কুদুনি একেবারে বের ক'রে দেবো,—তোকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বো।

এই মহা মার-মার কাট-কাট রবে ও ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কিতে মণিদাসের ভাবের নেশা ছুটিয়া গেল। সে যেন কেমন চমকভাঙ্গা হইয়া থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। তখনও তাহার উপর অজস্রধারে গালাগালি বর্ষণ চলিতেছে,—দুইএকটা ধাক্কাধাক্কিও চলিতেছে। ব্যাপার বুঝিতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না। অভিমানে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সজল-নয়নে কমলনয়নের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণেই জানাইতে লাগিল। বলিল,—ওহে মহাবাহু, তুমি না শরণাগতকে রক্ষা করিবে বলিয়া দুই বাহু প্রসারিয়া বসিয়া আছ? এই কি তোমার শরণাগতের রক্ষা? হায় প্রভু, আমি যে সকল ছাড়িয়া তোমাকেই সার করিয়াছি, তোমারই শরণ লইয়াছি, তাহা কি তুমি জান না? আজ সেই আমারই প্রতি তোমার যখন এতই উপেক্ষা, তখন তুমি যে কত শরণাগত-প্রতিপালক, তাহা ভালই বুঝা গিয়াছে। আজ তোমার প্রভুপণাও জানিলাম, আর তুমি তোমার ভৃত্যের প্রতি যে কতই করুণ, তাহাও জানিলাম। মণিদাস এই বলিয়া অভিমানভরে সেই নারিকেলমালার করতালযুগল শ্রীপ্রভুর সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ত্বরিতপদে চলিয়া গেল। হায়, প্রভু আমার প্রতি

উদাস হ'য়েছেন, তবে আর আমার আশা-ভরসা কিসের, এই ভাবিয়া উদাস-প্রাণে সে একটা মঠে যাইয়া প্রবেশ করিল এবং ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। দেখিতে-দেখিতে দিবা অবসান হইয়া গেল। শ্রীপ্রভুর সন্ধ্যা-ধূপ (রাত্রিকালের ভোগ) আরম্ভ হইল। মণিদাস মনের বিরসে আর শ্রীমন্দিরে গমন করিল না, অন্নাদিও কিছুই ভোজন করিল না, উপবাসেই শয়ন করিয়া রহিল। অধিক রাত্রে শ্রীহরির শয়নলীলাদি সমস্ত সেবা সমাপ্ত হইয়া গেল। ভাণ্ডারঘর বন্ধ হইল। দেউল 'নিশোধ' (জনমানবশূন্য) করা হইয়া গেল। কবাট বন্ধ করিয়া সেবকগণ যে যাহার আলয়ে চলিয়া গেলেন। এদিকে ভক্তবৎসল ভগবান্ পুরীরাজের প্রাসাদ অভিমুখে বিজয় করিলেন। রাজা তখন নিদ্রায় অভিভূত। শ্রীপ্রভু তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আজ্ঞা করিলেন,—রাজন্! তোমাকে তো বড়ই অজ্ঞানে মত্ত দেখিতেছি। তুমি তোমার রাজ্যের লাভ-লোকসান কিছুরই খবর রাখ না। দেখ, আমার পরম ভক্ত মণিদাস প্রতিদিন জগমোহনে আসিয়া নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া কত নাচগান করিয়া থাকে। আমিও তাহাতে কতই আনন্দ পাইয়া থাকি। সে আনন্দের কথা কি বলিব। যেমন কাহারও পাঁচ-সাতটী ছেলে আছে। তাহার মধ্যে যেটী সর্ব্বকনিষ্ঠ—এখনও বৎসর পূরে নাই, সে যেমন পা ঘেঁসিয়া আসিয়া অমৃত-সমান আধোআধো বচনে পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করে, মণিদাস আমার কাছে আসিয়া নাচিলে-গাহিলে আমি তাহার

অপেক্ষা অনেক অধিক আমোদ উপভোগ করিয়া থাকি। ভক্ত যখন প্রেমভরে ঢলিয়া-ঢলিয়া আমার সম্মুখে নাচিতে থাকে, আমার তখন সেই শিশুর চরণ-চালনের অপেক্ষাও তাহা সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। ভক্তের গদগদ অস্ফুট কণ্ঠস্বর আমার সেই শিশুর আধোআধো বাণীর অপেক্ষাও সুমধুর বলিয়া মনে হয়। আহা মহারাজ! আজ তোমার পুরাণপণ্ডা আমার সেই কনিষ্ঠ-কুমারের মত প্রিয়তম মণিদাসকে আমার সম্মুখ হইতে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। বাছা আমার সেই যে অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছে, আর আমার সম্মুখে আসে নাই। তাই, আমারও আজ মনে একটুকুও সুখ নাই—খাওয়া-দাওয়াও হয় নাই। তাহার অভাবে আমি যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। ক্ষণে-ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি। তুমি এক কার্য্য কর,—আমার সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম ভক্ত মণিদাসকে ডাকাইয়া আন এবং সম্মান-গৌরব-সহকারে স্বয়ং তাহাকে জগমোহনে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, আর সকলকে বলিয়া দাও,—কেহ যেন তাহার নর্ত্তন-কীর্ত্তনে বাধা না দেয়। সে আবার আনন্দভরে নাচিতে-গাহিতে আরম্ভ করুক। আমারও প্রাণ বিমল আনন্দে মাতিয়া উঠুক। তবে আমি আবার আহার করিব। রাজন্, আমার এই কথা অকাট্য সত্য বলিয়া জানিও। তোমাকে আরও একটী কথা বলি,—আমার এই যে জগমোহন, ইহা ভক্তজনের হিতের নিমিত্তই বিশ্বকর্ম্মা আনন্দ-মনে নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ-নর্ত্তনকীর্ত্তনের জন্যই ইহার এত বিস্তৃতি। নানা দেশের ভক্ত-

সকল জগমোহনে আসিয়া আমার রক্তিম অধরের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া—আমার চরণকমল ধ্যান করিয়া-করিয়া করতালাদি বাজাইতে-বাজাইতে নানা রঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিবে,—আমার নাম-গানে আপনি মাতিয়া অপরকে মাতাইতে থাকিবে,—ভাবভরে গড়াগড়ি দিতে থাকিবে,—আবার উঠিয়া কপালে যুগলকর রাখিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিতে থাকিবে,—সুখদুঃখের সকল কথা জানাইতে থাকিবে, ইহাতে তাহাদেরও আনন্দ, আমারও আনন্দ। আর এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই ত জগমোহন? আজি হইতে পুরাণপণ্ডা আর যেন আমার জগমোহনে পুরাণপাঠ না করে। পড়িতে হয় তো লক্ষ্মীর মোহনে যাইয়া প্রতিদিন পুরাণ পাঠ করুক। আমার ভক্তকে অপমান করা—তাড়াইয়া দেওয়া আমি অমনি-অমনি কিছুতেই সহিতে পারিব না।

পুরীরাজকে এইরূপ আদেশ দিয়া—পুরুষোত্তম জগন্নাথ ভক্ত মণিদাসের নিকটে বিজয় করিলেন। তাহার শীর্ষস্থানে গিয়া সুমধুর স্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,—প্রিয়তম মণিদাস! তুমি উপবাসে রহিয়াছ কেন? আমার যে বড় কষ্ট হই-তেছে। দেখ, তোমার উপবাসে আমিও উপবাসী রহিয়াছি। অভিমান ছাড়,—উঠ,—ভোজন কর। তোমার অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধের বন্দোবস্ত করিয়াছি। কল্য প্রাতেই তাহা জানিতে পারিবে। শ্রীনিবাস মণিদাসকে এইরূপে আশ্বাসবচনে আনন্দিত করিয়া শ্রীদেউলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মণিদাসও প্রভুর আদেশ অমান্য করিতে পারিল না। দয়াময়ের দয়া দেখিয়া তাহার

অভিমান ছুটিয়া গেল। সে আনন্দমনে প্রভুর গুণ গাহিতে-গাহিতে মহাপ্রসাদ ভোজন করিল। বলা বাহুল্য,—এই প্রসাদ-গুলি শ্রীপ্রভুই তাঁহার প্রিয়তম মণিদাসের জন্য ধড়ার অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

এদিকে নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন,—দুই হস্তে চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখিলেন,—সে প্রকোষ্ঠে জনমানবও নাই। মনেমনে বিচার করিলেন,—অহো, নিশ্চয়ই করুণাময় জগবন্ধু করুণা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তিনি তখনই শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন এবং পাত্রমিত্রদের ডাকাইয়া সকল কথা বলিয়া-কহিয়া বেগবান্ অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেলা তখন প্রায় একপ্রহর, এমন সময় নরনাথ শ্রীজগন্নাথের দেউলের সম্মুখে—যে মঠে মণিদাস অবস্থান করিতেছিল, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাদর সম্ভাষণে মণিদাসকে আপ্যায়িত করিলেন। কোলে বসাইয়া অনেক গৌরব-সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং হস্তে ধরিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া চলিলেন। তারপর পরমাদরে জগমোহনের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার মাথায় পাটশাড়ী বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন,—ওহে মণিদাস, তুমি একবার তোমার নারিকেলমালার করতাল বাজাইয়া নৃত্য-গীতি কর দেখি। শ্রীপ্রভুরও আনন্দ হউক, আমরাও আনন্দিত হই। করতালের কথা উঠিবামাত্র জগন্নাথের জনৈক সেবক মণিদাসের পরিত্যক্ত নারিকেলমালার করতাল-যুগল আনিয়া দিলেন। সে-ও আনন্দে

অধীর হইয়া 'চমালি' গান (খুব রসের মাতামাতির গান) ধরিয়া মহা নৃত্য জুড়িয়া দিল।

মহারাজের আদেশে সেই দিন হইতে পুরাণপণ্ডার জগমোহনে বসিয়া পুরাণ-পাঠ মানা হইয়া গেল। শ্রীমন্দিরের উত্তরপশ্চিমদিকে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দির। সেই মন্দিরের মোহনে (দরদালানে) পুরাণপণ্ডার পুরাণ-পাঠের স্থান নিরূপিত হইল। ভক্ত মণিদাসকে উপলক্ষ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার জগমোহন ভক্তগণের স্বচ্ছন্দে নর্ত্তন-কীর্ত্তনের জন্য চির উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

এ ঘটনা কত দিনের ঠিক বলা যায় না। কেননা উৎকল-কবি রামদাস কিংবা অন্য কেহ তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু অদ্যাবধি এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

অহো ভগবন্! ধন্য তোমার ভক্তবাৎসল্য। তুমি ভক্তের জন্য কি না করিয়া থাক? ভক্তের ভাবের লোভে তুমি আপন সম্মুখ হইতে পুরাণপাঠও মানা করিয়া দিলে?—মালাকারের মালা বাজাইয়া নৃত্যগীতির নিকটে ব্রাহ্মণ পুরাণপণ্ডার পুরাণব্যাখ্যাও অপকৃষ্ট করিয়া দিলে? ভাবগ্রাহি জনার্দ্দন, তুমি ধন্য! আর অহো ধন্য আমরা! যিনি জাতি-কুল ধন-সম্পদ্ বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া কেবল একটু ভালবাসার বশীভূত,—একবার নাম লইয়া নাচিলে-গাহিলেই গলিয়া যান,—এমন প্রভুকেও আমরা ভুলিয়া আছি? আমাদের গতি কি হইবে প্রভু?

রাম বেহেরা।

রাম বেহেরার বাড়ী কনকাবতীপুরে। কনকাবতীপুর একটী নগর—গোদাবরীতীরে অলকাপল্লী-নামক দেশে অবস্থিত। রাম-বেহেরা জাতিতে মুচি। তাহার ভার্য্যার নাম মূলী। সে বড় পতিভক্ত। একটী পুত্র, সে-ও পিতামাতার একান্ত অনুরক্ত। এই তিন জন লইয়া তাহাদের সংসার। রামবেহেরা নিত্যই চর্ম্মপাদুকা তৈয়ারি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া আনে এবং তাহাতেই পরম সুখে জীবন যাপন করে। নীচ মুচি হইলে কি হয়, তাহাদের অন্তঃকরণ বড় ভাল। অতিথি-অভ্যাগতকে হাত তুলিয়া কিছু দেওয়া আছে, সকল জীবে দয়া আছে, হরি-ভজনও করা আছে। রাম বেহেরার মুখে গীতগোবিন্দের পদ তো লাগিয়াই আছে। সে যেকোন কাজই করুক না কেন, গুন্-গুন্-গুন্-গুন্ করিয়া গীতগোবিন্দের পদ গাওয়ার আর তাহার বিরাম নাই। বেচারী লেখাপড়া জানে না, গীতগোবিন্দ কখনও পড়ে নাই। কাহারও মুখে শুনিয়া যাহা শিখিয়াছে—শুদ্ধ হ'ক অশুদ্ধ হ'ক তাহার অনুসন্ধান নাই—সে জোড়া-তাড়া দিয়া একরকম দাঁড় করাইয়া একটী পদ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, আর ভক্তিভরে সেইটীরই অনুক্ষণ সুর করিয়া আবৃত্তি চলিতেছে। সে পদটীর মূর্ত্তি এইরূপ,—

"সধীরে সধীরে সমীর। বহই যমুনার তীর॥
শ্রীবৃন্দাবন বালীকূদ। যহিঁ জন্মিত প্রেমানন্দ॥
বসতি বনে বনমালি। চিন্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কেলি॥"

বলা বাহুল্য, এই পদটী শ্রীজয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দের—"ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী"—এই পদের বিকৃত মূর্ত্তি। তা হউক, ভাবগ্রাহি-জনার্দ্দনের কাছে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মূর্খে 'বিষ্ণায়' বলিয়া প্রণাম করে, পণ্ডিতে 'বিষ্ণবে' বলিয়া প্রণত হইয়া থাকেন, কিন্তু ফল উভয়েরই তুল্য। ভগবান্ তো আর ব্যাকরণ-অভিধান দেখেন না ;—অন্তরের বিশুদ্ধ ভাবেরই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি। রামবেহেরার সরল প্রাণের এই গীতগোবিন্দ-গানে ভগবানের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। তাঁহার আনন্দ হইত বলিয়াই বর্ণবহির্ভূত দরিদ্র বেহেরার অন্তরেও আনন্দের আর অভাব হইত না।

একদিন সেই দেশের এক বড়লোকের বাড়ীতে চুরি হইল। চোরেরা তাঁহার ঘরে ধনরত্ন যাহা ছিল সকলই লইয়া পলাইল। এমন কি ঠাকুরঘরের দেবসিংহাসনটীও ছাড়িয়া যায় নাই। তাহারা অপহৃত সামগ্রী বিভাগের সময় বস্ত্রাবৃত দেবসিংহাসনটী বিভাগের জন্য বাহির করিল। মনে করিল—এতে কি-না-কি সামগ্রীই আছে। বস্ত্রাবরণ খুলিয়া দেখিল—দূর ছাই—এ যে কতকগুলা পাথরের নুড়ী! ফেলে দে, ফেলে দে, বলিয়া একজন সে গুলিকে দূর করিয়া ফেলিয়া দিল। হতভাগ্যেরা তো জানে না যে, এগুলি সেই মুনিঋষির দুর্লভ ভক্তি-মুক্তির

একমাত্র প্রদাতা শ্রীহরির শালগ্রাম-মূর্ত্তি। সেই চোরের দলের একটী লোকের কিন্তু সেই শিলার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয়া গেল। সে দেখিল শিলাটী বড় সুন্দর ;—

"অতি পৃথুল মনোহর। লাবণ্য শিলা দামোদর॥
অঞ্জন-কলারু চিক্কণ। ঝলিরে অমূল্য দর্পণ॥
তমাল দল নব-ঘন। কালিন্দীজলর সমান॥
ধিক করই ভৃঙ্গশ্রেণী। জ্যোতি নিন্দই নীলমণি॥
কস্তুরী-কলা ধিক্কারই। সমান এ সংসারে নাহিঁ॥'''

শিলাটী দামোদর শিলা। আকারে যেমন বড়-সড়, দেখিতেও তেমনি মনোহর। লাবণ্য যেন গড়াইয়া পড়িতেছে। চাকচিক্যই বা কত, যেন একখানি অমূল্য দর্পণ। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। অঞ্জন বল, তমালের দল বল, নবীন মেঘ বল, কালিন্দীর জল বল, তাহার উপর চেকনাই চড়িলে যেমন কাল হয়, এ কাল সেইরূপ কাল। তাহার উজ্জ্বল জ্যোতি ভৃঙ্গশ্রেণীকে ধিক্কার করে, নীলমণিকে নিন্দা করে, কস্তুরীকেও লজ্জিত করে। বলিতে কি, এ সংসারে তাহার তুলনা মিলে না। সেই চোর শিলা-সমষ্টির মধ্য হইতে এই দামোদর-শিলাটী বাছিয়া লইল। মনে-মনে ভাবিল,—এই শিলা লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইব। শুধুশুধু মাগিলে কেহ তো বড়-একটা কিছু দিবে না ; শিলা সঙ্গে থাকিলে ভিক্ষায় প্রচুর লাভ হইবে। আমি আর এ শিলা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। এই বলিয়া সে শিলাটী নিজের আলয়ে লইয়া গেল।

যে চোর—পরের সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহার শালগ্রাম-শিলা লইয়া দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া ভ্রমণ করা ভাল লাগিবে কেন? চুরির মত একটা চুরি করিতে পারিলেই যে তাহার সংবৎসরের খোরাক যোগাড় হইয়া গেল। সুতরাং তাহার আর পরামর্শমত কার্য্য করা হইল না—শালগ্রাম লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান পোসাইল না। একবার তাহার একজোড়া পাদুকার দরকার। সে ভাবিল, দেখি যদি এই চক্‌চকে নুড়িটীর বদলে মুচির নিকট হইতে জুতা-জোড়াটী আদায় করিতে পারি। সে পাষণ্ডের তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই,—অনায়াসেই সে সেই শালগ্রাম-শিলাটী লইয়া রামবেহেরা মুচির মন্দিরে গমন করিল। গিয়া বলিল,—ওহে মুচির পো! দ্যাখ, কেমন একটী নুড়ী এনেছি, একবার তোমার যন্ত্র-টন্ত্র ঘ'ষে দ্যাখ, এমন শক্ত পাথর আর জন্মায় না। কিন্তু বাপু, ব'লে রাখ্‌চি, আমাকে একজোড়া ভাল দেখে 'চিপুলি' (জুতা) দিতে হইবে।

ভক্ত রামবেহেরা তখন ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া—'সধীরে সধীরে সমীর' গাহিতেছিল। সে আস্তেব্যস্তে হস্ত পাতিয়া শিলাটী গ্রহণ করিল। ভাল করিয়া দেখিতে-দেখিতে শিলা তাহার নয়ন-মন ভুলাইয়া ফেলিল। সে দেখিল,—আহা হা হা, এ যে সাক্ষাৎ মরকত-মণি! সামান্য শিলার কি এত লাবণ্য হয়? রামবেহেরা পরমাদরে দামোদর-শিলাটী রাখিয়া দিল এবং তাহাকে প্রার্থিত পাদুকা দিয়া বিদায় করিল। সেই দিন হইতে রামবেহেরা আর সাবেক পাথর-নুড়ি স্পর্শ করে

না; যন্ত্র শাণাইতে হয় তো সেই শিলাতেই শাণাইয়া লয়; চামড়া কাটিতে হয় তো সেই শিলার উপরেই রাখিয়া কাটে; কিছু ঘষাঘষি করিতে হয় তো সেই শিলারই উপর ঘষিয়া থাকে। সেই দিন হইতে তাহার গীতগোবিন্দ-গানের মাত্রাটাও যেন আরও কিছু বাড়িয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন এক ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন। ব্রাহ্মণ বড় বিষয়ী, কিন্তু সদাচারনিষ্ঠ, নানা শাস্ত্রে বিচক্ষণ এবং বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ। যাইতে-যাইতে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি রামবেহেরার দিকে পড়িল। তিনি দেখিলেন,—সে একটী বর্ত্তুল কৃষ্ণোপল পায়ে চাপিয়া জল দিয়া অস্ত্র শাণাইতেছে। শিলাটীর বর্ণের একটু বিশেষত্ব ছিল। তাই ব্রাহ্মণ সেই শিলার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। তিনি যেন কতকটা থতমত খাইয়া গেলেন। ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য; এই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শালগ্রামশিলার উপর কি না অবোধ মুচী অস্ত্র শাণাইতেছে? হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ,—কি সর্ব্বনাশ!

ভাবিতে-ভাবিতে ব্রাহ্মণের নেত্র দিয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল,—তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; চোখের জল মুছিয়া, আত্মভাব গোপন করিয়া, রামবেহেরার নিকট গমন করিলেন। গিয়া বলিলেন,—ওহে বেহেরা! তোমার কাছে আমার কিছু প্রার্থনা

আছে, পূরণ কর তো প্রভূত পুণ্য উপার্জ্জন করিবে। আহা দেখ, তোমার ঐ শিলাটী বড় সুন্দর; দেখিলে আর নয়ন ফিরানো যায় না। তা বাপু, আমি ব্রাহ্মণ, আমার ঐ শিলাটী দেখিয়া বড় লোভ জন্মিয়াছে; তুমি ঐটি আমাকে দান কর। আমি চিরদিন তোমার যশোঘোষণা করিয়া বেড়াইব।

রামবেহেরা তাহার গীতগোবিন্দ-গান একটু থামাইয়া বলিল,—ঠাকুর! ও কি কথা বলেন? শিলাটী আমার টাকার মাল,—কাজের জিনিষ; আপনাকে এটি দিলে আমার অস্ত্র শাণানো-টানানো চোল্‌বে কিসে বলুন? ব্রাহ্মণ অমনি ট্যাক হইতেপাঁচটী টাকা বাহির করিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—ভাল, তোমার টাকার মাল তো এই টাকা পাঁচটী লও; শিলা কি আর জুটিবে না,—না, তোমার আর নাই-ই? তাতেই তুমি কাজ চালিও। কি জান, শিলাটী দেখে আমার বড় লোভ হ'য়ে প'ড়েছে; তাই পাবার এত আগ্রহ।

ব্রাহ্মণের কথার অবকাশে রামবেহেরা "সধীরে সধীরে" গান ধরিয়াছিল; শিলাটী ছাড়িতেও তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না। কিন্তু সে তো আর ধনবান্ নয়; রোজমজুরি ক'রে কোন রকমে দিন গুজরান্ করে মাত্র। চোখের সাম্‌নে পাঁচপাঁচটা টাকা! তাহার লোভ সে আর পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কাজেকাজেই সে "সধীরে সধীরে" গান থামাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে-করিতে শিলাটী ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের হস্তে তুলিয়া দিল।

ব্রাহ্মণের আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরমাদরে

শিলাটী মাথায় করিয়া লইয়া আপন আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। আসিয়া কূপোদকে স্নান করিলেন। পবিত্রভাবে সেই শিলাকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইলেন। সিংহাসনে বসাইয়া প্রথমত তুলসী-দল পুষ্প-মাল্য গন্ধ-চন্দন ধূপদীপ-নৈবেদ্য দিয়া সাধারণভাবে পূজা করিলেন। তারপর আবার ষোড়শ উপচার এবং বিবিধ উপাদেয় নৈবেদ্য নিবেদন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পূজান্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণতি স্তবস্তুতি ও নৃত্য-গীতি করিয়া আনন্দ-নিমগ্ন হইলেন। সেই দিন বলিয়া নয়, ব্রাহ্মণ প্রতিদিনই আনন্দ-মনে সেই দামোদরশিলার বিবিধ বিধানে পূজা-আরাধনা করিতে থাকিলেন।

ব্রাহ্মণ বাহ্যত ভগবানের পূজা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই পূজার ভিতর কিঞ্চিৎ ব্যবসাদারী ছিল। তিনি মনেমনে ভগবানের কাছে ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করিতেন। ভগবানের তাহা ভাল লাগিল না। চারিদিন না যাইতে-যাইতে সরল রামবেহেরার কাছে যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি তাহার সেই গীতগোবিন্দ-গান ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—হউক রামবেহেরা মূর্খ, কিন্তু তাহার অন্তঃ-করণ অতি পবিত্র। সে উদর-ভরণের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহে না, কল্পনার ছলনায় তাহার মন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায় না। উদরভরণোপযোগী শাকান্নেই তাহার পরম পরিতৃপ্তি। তাহার উপর, শুদ্ধ হউক, অশুদ্ধ হউক, আমার নামগানেই সে অহরহ মত্ত হইয়া আছে। আহা, সে যখন

গীতগোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে আমার মস্তকে জল দিয়া অস্ত্র ঘর্ষণ করিত, আমার মনে হইত—সে যেন আমায় পুরুষসূক্ত-মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইয়া অঙ্গ মুছাইয়া দিতেছে। আহা, সে যখন গীত-গোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে পাষাণের উপর অন্ন রাখিয়া আমাকে দিয়া বাটিয়া লইত, আমার মনে হইত—সে যেন আমাকে শাস্ত্রীয় মন্ত্রে পবিত্র পায়সান্ন নিবেদন করিতেছে। আহা, সে যখন গীতগোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে আমার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক চর্ম্ম কাটিতে প্রবৃত্ত হইত, আমার মনে হইত—সে যেন প্রীতির ভাষায় আমার অঙ্গ-কণ্ডূতির নিবৃত্তি করিতেছে। সে মূর্খ হউক, আমার আদর কদর না জানুক, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধ ভাবে আমি তাহার কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছি, ভাব-মূল্যে সে আমায় কিনিয়া লইয়াছে। আর এই ব্রাহ্মণ আচার-পূত পণ্ডিত হইলে কি হয়, বিবিধ মন্ত্রে নানা উপচারে আমার পূজা করিলে কি হয়, ইহার ভাব তো ভাল নয়; ও ভাবহীন ভালবাসা আমার ভাল লাগে না। যে আমার জন্য আমাকে না ভজিয়া বিষয়বিভবের জন্য আমাকে ভজনা করে—ভালবাসা জানায়, তাহার ভালবাসা কি আর আমাকে ভালবাসা? সে ভজনা বা ভালবাসা বিষয়েরই ভজনা—বিষয়েরই প্রতি প্রীতি-প্রকাশ। আমার প্রতি অন্তরের টান থাকিলে, ভজনার রীতি না জানিয়াও আমায় ভজনা করা হয়,—আমাকে ভালবাসা হয়, আর অন্তরের টান বিষয়ের দিকে থাকিলে, ভজনার রীতি জানিয়া-শুনিয়াও আমায় ভজনা করা হয় না,—আমাকে ভালবাসা

হয় না। আমার রাজ্য ভাবের রাজ্য ;—বিশুদ্ধ ভাব লইয়াই এ রাজ্যের কারকারবার। ভাবহীন ব্রাহ্মণের গৃহে আর আমি থাকিব না ; যাই—সেই ভাব-বিভোর বেহেরার গৃহে চলিয়া যাই। ভগবান্ এই ভাবিয়া একদিন রাত্রিকালে ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দিলেন,—দেখ, তুমি কল্য রজনীপ্রভাতেই আমাকে লইয়া রাম-বেহেরার কাছে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে চাও। তাহার বিশুদ্ধ ভাবে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। তোমার এ ভাবহীন আড়ম্বরের পূজা আমার ভাল লাগিল না। তাহার ভাবময় গীতগোবিন্দ-গানে আমার যে আনন্দ, তোমার ভাবহীন স্তবস্তুতি নর্ত্তনগীতির মধ্যে তাহার ক্ষীণ আভাসও পরিলক্ষিত হয় না। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার ঐশ্বর্য্যকামনা পূর্ণ হইবে। তুমি সত্বর আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস, নচেৎ তোমার সর্ব্বনাশ জানিও।

ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিয়া ভীতিভরে থরথর কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইবা মাত্র তিনি স্নানাদি সমাধা করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই শালগ্রামশিলা লইয়া রামবেহেরার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, সে আপন-মনে গীতগোবিন্দ-গানে মজিয়া আছে। তিনি তাহার সম্মুখে শিলাটী রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—ওহে রামদাস, এই নাও তোমার ধন তুমি নাও। অহো, তোমার জীবন ধন্য। তুমি ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছ। এই নাও তোমার শিলা তুমি গ্রহণ কর। ইহাকে তুমি সামান্য শিলা মনে করিও না।—

"এহি সে অনাদি নরহরি। সকল ঘটে চ্ছন্তি পূরি ॥
এহি'সে জীবর করতা। এহি সে গতি-মুক্তি-দাতা ॥
এহাঙ্ক পাদ আশ্রে কলে। জীব নিস্তার হেব ভলে ॥"

ইনি সেই অনাদি নরহরি। ইনিই সর্ব্বঘটে সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনিই সেই সকল জীবের কর্ত্তা। ইনিই সেই গতি ও মুক্তির প্রদাতা। ইঁহারই পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীব অনায়াসে নিস্তার লাভ করে। ইনি তোমার বিশুদ্ধ ভাবে ও গীতগোবিন্দ-গানে তোমার কাছে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। তাই আমাকে স্বপ্ন দিয়া আবার তোমার কাছে আগমন করিলেন; তুমি প্রস্তরবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণভরিয়া ইঁহার পূজা কর। আমি মহাপাতকী, আমার সে ভাগ্য নাই, আমার পূজা ইঁহার পছন্দ হইল না। অহো রামদাস, তোমার জীবন পবিত্র হইয়া গেল। তুমিই ভবসাগরের পর-পারে গমন করিলে,—ভগবানের একান্ত ভক্ত বলিয়া গণ্য হইলে।

ব্রাহ্মণের কথাগুলি শুনিবামাত্রই কেমন রামদাসের দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল। সে অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া তাঁহার চরণে প্রণতি জানাইল। ব্রাহ্মণ তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে-করিতে চলিয়া গেলেন, সে-ও ভক্তিভরে গীতগোবিন্দ গাহিতে-গাহিতে শালগ্রামশিলা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। গৃহে গিয়া তাঁহাকে দিব্য আসনে বসাইল। সম্মুখে শতশত দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। চন্দনচর্চ্চিত তুলসীদল দিয়া—যা মনে আসিল তাই বলিয়া আনন্দমনে পূজা করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুক্ষণ পূজা

করিয়া সে আর গুন্‌গুন্‌ করিয়া নয়, গলা ছাড়িয়া গীতগোবিন্দের গাহনা জুড়িয়া দিল। তারপর ভাববিভোল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইল,—হে প্রভু! আমি অতি অজ্ঞান—অতি দুর্জ্জন পতিত হীন ব্যক্তি। দিবারাত্রি চর্ম্ম কাটাই আমার কর্ম্ম। শৌচ নাই,—সদাচার নাই। গাত্রের দুর্গন্ধে প্রেতও পলায়ন করে। হায় প্রভু, মন্দমতি আমার মদ্যই হইল উপাদেয় খাদ্য। এহেন অস্পৃশ্য প্রাণীর প্রতি তুমি কি করিয়া করুণা বিস্তার করিলে বল দেখি? ইহা হইতেই জানিতেছি যে, তুমি যথার্থ ই করুণাময়—যথার্থ ই পতিতপাবন।

রামবেহেরা ঐদিন হইতে জাতীয় কর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিল। পরিধানে ডোর-কৌপীন, কণ্ঠে তুলসীর মালা, করমূলে কঙ্কণ, চরণে ঘুঙঘুর ধারণ করিয়া করতাল বাজাইয়া উচ্চকণ্ঠে গীতগোবিন্দের পদ নাচিয়া-নাচিয়া গাহিতে লাগিল। আহা, সে যখন ভাবে গদগদ হইয়া নৃত্য করে, তখন আর তাহাকে অশুচি মুচি বলিয়া মনে হয় না; সে যেন কোন একজন প্রেমিক বৈষ্ণব প্রেমের প্রাবল্যে হেলিয়া-দুলিয়া নাচিতেছে! নর্ত্তন-সময়ে তাহার নয়ন দিয়া অনর্গল প্রেমাশ্রু নির্গলিত হইতে থাকে; পুলকে-পুলকে সকল অঙ্গ ছাইয়া ফেলে। সে কখনও থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে; কখনও বা স্থাণুর মত স্থির হইয়া রহিয়া যায়; আবার কখনও মহা হুহুঙ্কার ছাড়িয়া লাফাইতে থাকে। সে কখনও হাহা-হাহা করিয়া অট্টহাস্যের উৎস ছুটাইয়া দেয়, কখনও বা ক্রন্দনের করুণ রোলে হৃদয়ের বেদন বেদন করে, আর কখনও

বা দুইটি হাত উর্দ্ধে তুলিয়া অন্তরের কথা জানাইতে থাকে। তখন বলে,—কম্পিত-কাতর-কণ্ঠে বলে,—ওহে ও বংশীবদন মদনমোহন! তোমায় নমস্কার নমস্কার। তোমার ঐ মদন-কদন বদনখানি কি আমায় একবার দেখাইবে না? ঐ সাগর-ছেঁচা-মাণিক-মাখা—ঐ চাঁদনিংড়ানো-অমিয়মাখা—ঐ টুক্‌টুকে ঠোঁটে হাসিটুকুমাখা মুখখানি কি একবার দেখাইবে না? জানি, জানি প্রভু, আমার এ আশা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশা অপেক্ষাও দুরাশা;—জানি, জানি প্রভু, তোমার দর্শন লাভ সুরমুনিসজ্জনেরও সুদুর্লভ;—জানি, জানি প্রভু, বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাঞ্ছা করিয়াও বাঞ্ছানিধি তোমার দর্শনে বঞ্চিত হন; তখন ছার অস্পৃশ্য মুচি আমি কোথায়? কিন্তু চিন্তামণি, তোমায় যে সাক্ষাৎ না দেখিয়া, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। ঐ ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক বিকাশের মত অন্তরে একবার ভাসিয়া উঠিলে, আর সাধ মিটাইয়া দেখিতে-না-দেখিতে শূন্যেশূন্যে মিশিয়া গেলে, এ দেখায় তো আর মনকে বুঝাইয়া রাখা যায় না প্রভু? তুমি অধমতারণ করুণার প্রস্রবণ বলিয়াই বলিতে সাহস হয়,—প্রভু, একবার দয়া করিয়া আমার নয়নসমক্ষে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াও; আমি সাধ মিটাইয়া তোমায় দেখিয়া লই। ঠাকুর হে, তুমিই তো আমার সাহস বাড়াইয়া দিয়াছ,—সদাচার-পূত বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের গৃহ ছাড়িয়া অশুচি মুচির গৃহে আসিয়া তুমিই তো আমার সাহস বাড়াইয়া দিয়াছ। আর যদি দেখা না-ই দিবে, তবে এখানে আসিবার দরকারই বা ছিল কি? না আসিলে তো আমি তোমার

বিরক্ত করিতে সাহসী হইতাম না? তোমার ভয় নাই ঠাকুর, ভয় নাই; আমি তোমার কাছে ধন জন বিষয়-বৈভব ইন্দ্রত্ব-চন্দ্রত্ব কিছুই চাহিব না,—সিদ্ধি-ঋদ্ধি ভুক্তি-মুক্তি কিছুরই প্রার্থী হইব না,—তোমার ভক্তের অধিকৃত অপ্রমিত সম্পত্তির নিমিত্ত লালসা জানাইব না,—তোমার ভয় নাই ঠাকুর, ভয় নাই। তুমি একবার এস। আমি কাঙ্গাল বটে, কিন্তু আর কিছুর নয়, তোমারই কাঙ্গাল—একবার তোমায় দেখিবার কাঙ্গাল। দাও দাও প্রভু, একবার সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া এ কাঙ্গালের সাধ পূর্ণ করিয়া দাও।

এই ভাবেই তাহার শালগ্রাম-উপাসনা চলিতে লাগিল। ক্রমে শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শনের উৎকণ্ঠা তাহার এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, সে আহার-নিদ্রা সমগ্র ত্যাগ করিয়া ফেলিল। দিন নাই, রাত্রি নাই,—কেবল কথা,—হায় প্রভু! দেখা দাও, দেখা দাও। ভগবান্ তাহা জানিলেন।—

"সে প্রভু ভকত-বৎসল। ভকতভাব তার মূল॥
ন ঘেণে ক্রিয়া অভিমান। ন ইচ্ছে যজ্ঞ তপ দান॥
তীর্থব্রতরে নোহে বশ। কেবল মূলটী বিশ্বাস॥
নিষ্কাম শুদ্ধ বুদ্ধি যার। সে অটে বান্ধব তাহার॥
নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা তার নাহিঁ। জাতি অজাতি ভিন্ন কাহিঁ॥"

জানিবেন না-ই বা কেন? সে প্রভু যে ভক্তবৎসল;—ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবই যে তাঁহার একমাত্র প্রীতির সামগ্রী। তিনি কাহারও ক্রিয়া কিংবা অভিমান গ্রহণ করেন না, যজ্ঞ-তপ-দানের অভিলাষ রাখেন না। তিনি কাহারও তীর্থপর্য্যটন বা ব্রতা-

নুষ্ঠানের বশীভূত নহেন, কেবল একমাত্র বিশ্বাসেরই বশীভূত। যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ এবং কামনাশূন্য, সে-ই তাঁহার বন্ধু। তা তাহার নিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠা থাকুক আর না-ই থাকুক, তৎপ্রতি তিনি লক্ষ্য রাখেন না; জাতি বা অজাতিরও ভেদ-বিচার করেন না।

ভাবগ্রাহী রামবেহেরার বিশুদ্ধ ভাবের আকর্ষণে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি এক ব্রাহ্মণ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার গৃহে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—সে ভাবভোলে ঢলিয়া-ঢলিয়া নৃত্য করিতেছে; কখনও বা ত্রিভঙ্গ হইয়া গীত-গোবিন্দের পদ গাহিতেছে; আর কখনও বা মাথা নাড়িয়া নাচিতে-নাচিতে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীশালগ্রামের সমীপে গমন করিতেছে এবং বাতুলের মত কত কি আবোল-তাবোল বকিতেছে। ভক্তের এই ভাব দেখিয়া আনন্দময়ের আর আনন্দ ধরে না। তিনি মন্দমন্দ হাস্য করিতে-করিতে যেন একটু বিদ্রূপের ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে ও রামদাস! বলি ব্যাপারখানা কি? তোমার এত নাচুনি-কুঁদুনির কারণটা কি, একটু খোলসা করিয়া বল দেখি? বলি বাপুহে, দিন নাই রাত্রি নাই, এত গান গেয়েই বা মর কেন; সে কথাটাও একটু স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দাও দেখি? বলি, এই বাজখাঁই গলাবাজিতে তুমি কাহাকেই বা রাজি করিতে চাও?—ইহার জবাব পাইলে প্রকৃতই প্রীতি লাভ করিব।

রামবেহেরার সংজ্ঞা থাকা আর না-থাকা যাঁহার হাত, স্বয়ং

তিনিই যখন জিজ্ঞাসুরূপে তাহার সংজ্ঞা সম্পাদনে যত্নপর, তখন তাহার সংজ্ঞা না হইবে কেন? তাহার সেই ভাব-বিভোর অবস্থায় অন্য কেহ আহ্বান করিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ভগবানের আহ্বানে তাহার সে ভাবের অভাব ঘটিল, সে ভিতরের রাজ্য হইতে বাহিরের রাজ্যে আসিয়া পড়িল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিল,—সম্মুখে দিব্য ব্রাহ্মণমূর্ত্তি। দেখিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল এবং বিনীতভাবে বলিল,—ঠাকুর, আমি মহা মূর্খ মহা নারকী, আমার অপরাধ লইবেন না। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার যোগ্যতাও আমার নাই। তবে যথাঘটনা আপনার নিকটে নিবেদন করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি শ্রবণ করেন।

এই বলিয়া সে তাঁহার সমীপে সেই শালগ্রামশিলার প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ফিরাইয়া দিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই বর্ণনা করিল। তারপর কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—ঠাকুর হে! সেই ব্রাহ্মণ আমায় যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন,—ওরে, তুইএই শিলাকে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধিতে পূজা কর্,—তাঁহার দেখা পাইবি। ঠাকুর, আমি মূর্খ মুচি বই তো নয়, পূজা-টুজা কিছুই তো জানি না, যা মনে আসে তাই বলিয়াই পূজা করিতে বসি, তারপর যে আমি কেমনতর হইয়া যাই, কিছুই জানি না, কি বলিতে কি বলি, কি করিতে কি ই বা করি, কিছুই জানি না। সেই ব্রাহ্মণ যে বোলে গেলেন,—তুই এঁরি পূজা কর্ ভগবানের সাক্ষাৎকার পা'বি, সেই উৎকণ্ঠাময় আশাতেই আমি ইঁহার কাছে

উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া থাকি। হায় ঠাকুর! দিন তো ফুরায়ে এলো, দেখা কি তাঁর পাবো না? ওগো তুমি বোলে দাও,—দেখা কি তাঁর পাবো না? হায় হায় প্রভু, দেখা দাও, দেখা দাও।

এইরূপ বলিতে-বলিতে রামবেহেরা যেন উন্মত্তের মত অধীর হইয়া উঠিল। বোধ হয় তখনও পরীক্ষার শেষ হয় নাই; তাই ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ তাহাকে আশ্বাসের অমৃতসেচনে অভিষিক্ত না করিয়া অনাশ্বাসের বিষদিগ্ধ বাণীতে বলিলেন,—বাপু হে! তোমার আশাও তো কম নয় দেখিতেছি? যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্রও সমাধিযোগে যাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারেন না, নীচ মুচি হইয়া তুমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চাও? আমি বলি, তুমি এমন দুরাশায় বিসর্জ্জন দাও,—গরীবের ছেলে গতর খাটাইয়া খাও-দাও, স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াও।

ব্রাহ্মণের বাক্যবাণে রামদাসের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে আর থাকিতে পারিল না, ছোট-মুখে দুইটা বড় কথা কহিয়া ফেলিল। সে যাঁহার গরবে গরবিত, বড় গলা করিয়া তাঁহার—সেই পরম করুণ পতিতপাবনের করুণার বড়াই গাহিতে প্রবৃত্ত হইল। বলিল,—

"শুন হে ব্রাহ্মণ-গোসাঞি।	কথাএ কহিবই মুহি ॥
স্বামীর স্নেহ যেবে হেব।	তা পত্নী অসুন্দরী থিব ॥
কাণী কুবুজী ছোটী কেম্পী।	হোইন থিব সে যদ্যপি ॥
কিচ্ছি হিঁ গুণ তা ন থিব।	স্বামীর দয়া প্রবল হেব ॥
বলে সে কোলে নেই ধরি।	সুভাগী বোলাএ সে নারী।

কেড়ে সে হেউ রূপবন্তী। শ্রদ্ধা ন করে যেবে পতি ॥
কি হেবে যেতে গুণ থিলে। এহা বিচার কর ভলে ॥
সে দয়ানিধি ভগবান। অবশ্য দেবে দরশন ॥
নোহিলে মোর প্রাণ যিব। হত্যা তাহার পরে হেব ॥"

ওহে ব্রাহ্মণ-গোঁসাই! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য; তবুও আপনাকে একটা কথা বলি। স্বামী যদি ভালবাসে,—স্বামী যদি আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লয়, পত্নী যতই কেন কুরূপা কুবুজা কাণা খোঁড়া হাতনূলা বা গুণহীনা হউক, তাহাকে সকলে "সৌভাগ্যবতী" বলিয়া থাকে। আর স্বামী যদি প্রীতিমমতার দৃষ্টিতে না দেখে, পত্নীর যতই কেন রূপ গুণ থাকুক, তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় না। দরকার হইল—স্বামীর দয়া লইয়া। ঠাকুর, বলিব কি; আমার স্বামী ত অগাধ দয়ার অপার বারিধি,—অশেষ গুণের গুণনিধি, তিনি আমায় দেখা দিবেনই দিবেন। যদি দেখা না-ই দিবেন, তবে তিনি জোর করিয়া এ অশুচি মুচির ঘরে আসিবেন কেন,—এ কদাচারী কদাহারীকে সকল ছাড়াইয়া তাঁহার নামে মাতাইবেন কেন? তাঁহার সেই আদর-দয়ার পরিচয় পাইয়াই সাহসে বুক বাঁধিয়া আছি—দয়াময় আমায় দর্শনদান করিবেনই করিবেন। আর যদি তাই-ই হয়,—তিনি যদি দেখা না দিয়া মর্ম্মপীড়ার মুমূর্ষুর-দাহে দগ্ধবিদগ্ধই করেন, তবে আমি এ জীবন আর রাখিব না;—আত্মহত্যার অপ্রমিত পাতক তাঁহার উপর চাপাইয়া,—প্রাণভরা ব্যাকুলতা লইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিব,—তাঁহারই অদর্শন-অনলে আত্মাহুতি প্রদান

করিব। এইরূপে মরিয়া-মরিয়া কোন-না-কোন জন্মে তো তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইব?

এইরূপ বলিতে-বলিতে বাষ্পবেগে রামদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। উৎকণ্ঠার আতিশয্যে—নৈরাশ্যের তীব্র তাড়নে সে যেন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আর তাহার নেত্র দিয়া দরদর অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। ভক্তের এই বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ভগবানের বড় আনন্দ হইল। তিনি আর তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বীণাবিনিন্দিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ওরে রামদাস! তোরই জীবন ধন্য,—তুই ভাবমূল্যে আমায় কিনিয়া লইয়াছিস্। তুই একবার নয়ন মুদিয়া ছাখ্ দেখি,—তোর প্রীতির টানে কে আমি এসেছি?

আনন্দময়ের অশ্বাসময় বাক্যে রামবেহেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। নয়ন নিমীলন করিয়া দেখিল,—কি সুন্দর কি সুন্দর,—মুরলীবদন মদনমোহন তাহার হৃদয় জুড়িয়া দাঁড়ায়ে আছেন। আহা, তাঁহার কি রসিয়া বাঁশী গো, সুধার রাশি হাসি গো, কি সুন্দর কি সুন্দর! সেই দিব্য রূপ দেখিতে-দেখিতে রামবেহেরা আপনাকে হারাইয়া ফেলিল,—যাহা দেখিতেছিল তাহাও যেন হারাইয়া ফেলিল। অমনি ব্যাকুলভাবে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখে,—ত্রিভুবনসুন্দর ত্রিভুবন আলো করিয়া ত্রিভঙ্গভঙ্গে দাঁড়ায়ে আছেন। প্রাণনাথকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাহার প্রাণের সাধ মিটিয়া গেল। প্রভুও অমনি দেখিতে-দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। একবার দেখিয়া রামদাসের দেখিবার সাধ

আরও অধিক বাড়িয়া গেল। সদাই তন্ময়ভাব। সদাই মুখে হাহুতাশ। সদাই অন্তর অমৃতময়। সদাই বাহিরে বিষজ্বালা। এই বিষামৃতের মিলিত অবস্থায় তাহার অবশিষ্ট জীবন যাপিত হইয়া গেল। সে দেহাবসানে দিব্যধামে গমন করিয়া শ্রীহরির পার্ষদ-শরীর লাভ করিল।

নারায়ণ দাস।

"সাজগোজটা যে কোথাও যাবার-যাবার দেখ্‌চি ?"

"হাঁ, তাই বটে,—অযোধ্যাপুরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইব, স্থির করিয়াছি।"

"অ্যাঁ, এ—কে—বা—রে অ—যো—ধ্যা—পু—রে ?"

"হাঁ, তাই, তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

মালতী এতক্ষণ হাসিহাসি-মুখে পতির সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু 'তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি' এই কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। উত্তেজনার স্বরে তিনি পতিকে বলিয়া উঠিলেন,—"কি, আমার কাছে বিদায় ? আমি কে ? আমার কি নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে ? আমি তো আপনার চরণের পরিচারিকা বই আর কিছুই নয়। আমার কাছে বিদায় ? আপনি যেখানে, কায়ার পশ্চাতে ছায়ার মত দাসীও সেখানে অনুগন করিবে। আমার নিকট আবার বিদায় কিসের ?"

পতিব্রতা পত্নীর পতিভক্তিময় অমৃতোপম বাক্যে নারায়ণদাসের বড় আনন্দ হইল। তিনি হাস্য-প্রফুল্ল-মুখে সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, —"বেশ বেশ, সাধ্বি! তোমার কথায় যারপরনাই প্রীতি

লাভ করিলাম। চল, তুমিও চল, দুইজনে মিলিয়াই অযোধ্যা-পুরীতে গমন করি।"

পতির প্রীতিময় সংলাপনে সতীর অভিমান-দুঃখ দূর হইয়া গেল। আনন্দে হৃদয়-বদন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি শিশিরসিক্ত প্রভাতপঙ্কজের মত বড়ই মধুর বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

বঙ্গদেশ। গঙ্গাতীরে কীর্তিচন্দ্র রাজার রাজ্য। করণ নারায়ণদাস সেই রাজ্যে বসবাস করিতেন। যেমন ধনী, তেমনই গুণী। কিন্তু গুণের গরব ছিল না—ধনের গরম ছিল না। সাদাসিদে লোক। সকলের সঙ্গেই হাসিখুশী মেশামিশি। পরধনে লোভ নাই। পর-রমণীতে কু-নজর নাই। মিথ্যা বা বাজে কথা বলা নাই। খোলা প্রাণ, খোলা হাত। নেহাত গোবেচারি ; দেখিলে বুঝিবার যো নাই, অত বড় একটা ধনী মানী গুণী লোক। অত বিষয়, সে দিকে আসক্তি নাই। প্রাণ সেই ভগবানের চরণেই পড়িয়া আছে। পত্নী মালতী মূর্ত্তিমতী পতিভক্তি। তাঁহার মত সুন্দরী বুঝি স্বর্গেও সম্ভবে না।

সকল সুখ সকলের ভাগ্যে তো ঘটে না; তাই ইঁহাদেরও একটী অসুখ ছিল,—পুত্র নাই, কন্যা নাই। ইঁহাদের সংসারে অনাসক্তিরও ইহা অন্যতম কারণ। তবে ইঁহাদের দয়ার গুণে বাহিরের পুত্রকন্যার বড় অভাব ছিল না। অনেকেরই ইঁহারা মাতাপিতার স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

নারায়ণদাসের অন্তঃকরণটা বড় বৈরাগ্যপ্রবণ। বয়স বেশী

হইয়াছে, সংসারে রহিয়া পরের উৎপাত ভুগিতে আর তাঁহার ভাল লাগিল না। সদাই যেন কোথায় যাই কোথায় যাই। শেষে মনেমনে স্থির করিলেন, মোক্ষদাত্রী অযোধ্যাপুরী যাইয়াই অবশিষ্ট জীবন যাপন করি। যেমন সংকল্প অমনই কাজ। তিনি সাজিয়াগুজিয়া পত্নীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। তাহার পর, তাঁহাদের কথাবার্ত্তা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মালতী যখন যাইতে চাহিলেন, তখন কাজেকাজেই নারায়ণ-দাসকে একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইল। তিনি তীর্থবাসের উপযোগী আসবাবপত্র বসনভূষণ বাসনকোসন থলিয়ায় পূরিয়া চারিটী বলদে বোঝাই করিয়া লইলেন। অনেক সাধের পাতা সংসার পাতানো-ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিয়া, কতিপয় সম্পত্তি দেবসেবার্থ সমর্পণ করিয়া, সে এক মহা শোক-কোলা-হলের মধ্যে বাটীর বাহির হইলেন। দাসদাসী কাহাকেও সঙ্গে আসিতে দিলেন না। কেবল মালতী ছায়ার মত তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

চারিটি বলদ আগেআগে চলিয়াছে। আর তাঁহারা দুইটী প্রাণী অবিরাম রাম-নাম করিতেকরিতে বলদের পাছুপাছু চলিতেছেন। যেখানে পান্থশালা পান, সেইখানেই বিশ্রাম করেন, বলদদের খাইতে দিয়া আপনারাও স্নানাহার সারিয়া লইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে অন্যান্য পথিকের সহিত আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এইরূপে কিছুদিন পরে তাঁহারা পবিত্র চিত্রকূট-পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেইখানে গিয়া অবধি তাঁহাদের অন্তঃকরণ যেন কি এক অমৃতরসে আপ্লুত হইয়া গেল। তাঁহারা যেন রঘুরাজ রামচন্দ্রের লোক-পাবনী লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কেবলই ভাবেন,—হায়, এই সেই চিত্রকূট! অরণ্যে যাইবার পথে—গুহক মিতার নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণসহায় সীতাপতি এইখানেই প্রথমে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। হায়, এইস্থানই মুনি-ঋষির আশ্রমে পরিপূর্ণ ছিল। মুনিবেশধারী প্রভুরাও আমাদের মুনি-ঋষির মত এইস্থানেই পরমানন্দে বিচরণ করিতেন। হায়, সতীশিরোমণি জনকনন্দিনীও এখানে মুনিপত্নীগণের সোহাগ-আদরে কতই না প্রীতিপ্রফুল্ল হইতেন। হায়, ভ্রাতৃভক্ত ভরত এইখানেই সেই দুঃসহ পিতার মৃত্যুবার্ত্তা লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হায়, এইখানেই সেই সোদর-সৌহার্দ্দ্যের পিতৃভক্তির ও সত্যনিষ্ঠার পূত প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। হায়, চিত্রকূট! তুমি আমাদের হৃদয়ের নাথ অযোধ্যা-নাথের কতই না লীলাকথা হৃদয়ে গাঁথিয়া, কতই না প্রাকৃতিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, সেই লীলার স্মারক স্তম্ভরূপে দাঁড়ায়ে আছ। হে বন্ধুবর! তুমি সেই লীলাময়ের লীলার মালা গলায় পরিয়া অনন্ত কাল দাঁড়ায়ে থাক, আর আমাদের মত পাপী তাপী তোমাকে দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাউক।

নারায়ণদাস পত্নীর সহিত কিছুদিন সেই চিত্রকূটেই থাকিলেন। সাধুমহান্তের আশ্রমেআশ্রমে বেড়াইয়া বেড়ান, তাঁহাদের ভ্রান্তি-নাশক শান্তিমাখা সদুপদেশ শ্রবণ করেন, আর আনন্দেআনন্দে

আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাই যাইযাই করিয়া সেখান হইতে আর তাঁহাদের যাওয়া হয় না। তাঁহারা সেখানে দানপুণ্য অনেক করিলেন, সাধুসেবা বৈষ্ণবসেবা সংকীর্ত্তনমহোৎসব করিলেন, তার পর কিছুদিন-পরে অযোধ্যা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কথা যতই তাঁহাদের মনে পড়ে, ততই তাঁহারা বিষম ব্যথায় কাতর হইয়া পড়েন।—হায়, অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু আমাদের বনেবনে বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আর তাঁহার ছার ভৃত্য আমরা উত্তম পথে চলিয়া যাইব, তাহা তো কিছুতেই হইতে পারে না, এই ভাবে তাঁহারা চিত্রকূট হইতে আর রাজপথে গমন না করিয়া বনপথে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বনও যেমনতেমন নয়। দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। চারিদিকেই বড়বড় গাছ। গাছের উপরিভাগ লতায় পাতায় ঢাকা, তলদেশ তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন। পেচকের ঘুৎকার, পার্ব্বত্য প্রস্রবণের ঝঙ্কার এবং হিংস্র শ্বাপদের চীৎকার—সকলে মিলিয়া সে এক অদ্ভুত একতানবাদনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর ঝিঝি-পোকার বিরাম-বিহীন সুরের বাহার তো আছেই। সেই সম্মিলিত স্বর শুনিলে প্রাণ ভয়ে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু নারায়ণ-দাসের তাহাতে কিছুই আসিয়া গেল না। তিনি অকুতোভয়ে সেই অরণ্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সেই চারিটী বলদ আর মালতী ছাড়া অন্য কেহই নাই। বাহিরে আর কেহ না থাকিলেও পতিপত্নীর অন্তরে আর এক জন সঙ্গী ছিলেন;

তিনিই তাঁহাদের বল-ভরসা—যাহা বল সকলই। নারায়ণ-দাস উচ্চকণ্ঠে তাঁহারই নামলীলা গান করিতেছেন। সেখানে লোকালয় নাই, লোকলজ্জাও নাই, তাই মালতীও পতির সহিত গলা মিলাইয়া সেই গানের দোহারকি করিতেছেন। গাহিতে-গাহিতে অন্তর্য্যামীর কমনীয় মূর্ত্তি যেন তাঁহাদের নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে; আর তাঁহারা তাঁহারই লীলা-রসে আত্মহারা হইয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছেন। সেই অন্তর্নিহিত বস্তুরই কি এক স্বভাব, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে ভীষণ বলিবার মন্দ বলিবার বুঝি আর কিছুই থাকে না; তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি যেন ভিতর ফুটিয়া বাহির হইয়া, বাহিরের সকলটাই সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার করিয়া দেয়। তাই আজ এই ভীষণ বনে করণদম্পতী নয়নতর্পণ রমণীয় দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন।

পতি-পত্নী পথ চলিতেছেন বটে, কিন্তু কোন্ পথে যে যাইতে-ছেন,—ঠিক অযোধ্যার পথ, কি আর কোন পথ, তাহার কিছুই ঠিক নাই। আহার নাই, নিদ্রা নাই; তাহার অনুসন্ধানও নাই। কেবল বলদের অনুরোধে মাঝেমাঝে একআধটু বিশ্রাম করেন, তাহাদের খাওয়ান-দাওয়ান, আবার পথ চলিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ যাইতেযাইতে তাঁহারা একদিন প্রাতঃকালে এক শবরপল্লীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এদিকে-ওদিকে শবরগণকে বিচরণ করিতে দেখিয়া নারায়ণদাস মনেমনে ভাবিলেন,—ভাল, অযোধ্যার পথটা কাহাকেও একবার সুধাইয়াই লই না কেন? তিনিও জিজ্ঞাসা করিবেন-করিবেন করিতেছেন, এমন

সময় জনাদশেক দুষ্ট শবর তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। হিংসাজীবী পাষণ্ডগণ দূর হইতেই ইহাদিগকে দেখিয়া মৎলব আঁটিয়াছে,—"এরা একজন মেয়ে একজন পুরুষ বৈ তো নয়, সঙ্গে মালপত্রও অনেক দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় কোন মহাজন-টহাজন হ'বে, তা এদের অগম্য বনে নিয়ে গিয়ে একেবারে কর্ম্ম ফরসা ক'রে দেওয়া যাক্; তারপর টাকাকড়ি জিনিষপত্র যাহা থাকে, বখরা ক'রে নেওয়া যাবে এখন।" নারায়ণদাস না বলিতে-বলিতে তাহারাই আগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁহে বিদেশি! বলি এ দুর্গম বনে যাচ্ছ কোথা?" দুর্বৃত্তগণ এমনই ভাবখানা দেখাইল, যেন কত সরল—কত সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়াই আসিয়াছে। ভক্ত নারায়ণদাসের মনে তো আর দ্বিধা নাই, তিনি তাহাদের আদরের ভাবে গলিয়া গেলেন। ভাবিলেন,—আহা, ইহারা বড়ই সরল। নাগরিক চাতুরী তো এই দুস্তর অরণ্য অতিক্রম করিয়া আসিতে পারে না, তাই ইহাদের হৃদয়ে এত সহৃদয়ের ভাব,—এত অমায়িক ব্যবহার। দেখ না কেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতে-না-করিতে ইহারাই আসিয়া অগ্রে আমাকে গন্তব্য পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—বাপু হে, তোমাদের সরল ও অমায়িক ভাব দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমরা কোথায় যাইতেছি, বলি শুন,—

"শ্রীরামচন্দ্র রঘুবংশী। যেহ অযোধ্যাপুরবাসী॥
সকল-সংসার-কারেণী। সকল-জীব-চিন্তামণি॥

মহামহিমা মহামেরু। ভকত-বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
তাঙ্ক দর্শনে ইচ্ছা করি। যাউছুঁ অযোধ্যা-নগরী ॥”

আমরা সেই রঘুকুলতিলক অযোধ্যানায়ক শ্রীরামচন্দ্রকে,—সেই সকল সংসারের কারণ, সকল জীবের চিন্তা-রতন,—সেই মহামহিম মহা মহীয়ান্,—সেই ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার বাসনায় অযোধ্যানগরীর উদ্দেশে গমন করিতেছি।

নারায়ণদাসের মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে দুষ্টগণ মিষ্ট কথার মোহন আবরণে আত্মভাব গোপন রাখিয়া শিষ্টের মত বলিয়া উঠিল,—আঁ্যা, অবধান! তুমি ক’রেছ কি? এই ঘোর অগম্য বনে একাএকা যাবে কি ক’রে? তা আমাদের সঙ্গে দেখা হ’য়ে ভালই হ’য়েছে। আমরাও সেই অযোধ্যাপতিকে দর্শন ক’রতে অযোধ্যাপুরেই যাচ্ছি, চল,—তোমাদের আর ভয় নাই,—আমাদের সঙ্গেই চল। আমরা তোমাদের ‘রখুআল’ (রক্ষক) হ’য়ে সঙ্গেসঙ্গেই যাচ্ছি।”

শবরবৃন্দের বাক্য শুনিয়া তাঁহারা একবার পরস্পর চক্ষুঠারাঠারি করিলেন। তাহাদের কথাটা যেন তাঁহাদের তত ভাল লাগিল না। বিশেষত তাঁহারা যাঁহার অভয়পদে আত্মসমর্পণ করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছেন, তিনি ছাড়া—সেই বীরেন্দ্রকেশরী রামচন্দ্র ছাড়া অন্য কাহাকে রক্ষকরূপে অঙ্গীকার করিতে তাঁহারা বড়ই নারাজ। তাই তাঁহারা তাহাদিগকে নির্ভীকভাবে বলিলেন,—

"বোইলে— প্রভু রঘুনাথ। অনাথ লোকঙ্কর নাথ ॥
যে কাণ্ড-কোদণ্ড-ধারণ। সে আম্ভ সঙ্গ বোলিজান ॥
সে যেনে নেবে—তেনে যিবুঁ। আম্ভ আয়ত্ত নাহিঁ বাবু ॥"

বাপু হে! সেই অনাথনাথ প্রভু রঘুনাথ,—সেই ধনুর্ব্বাণধারী অযোধ্যাবিহারীই আমাদের একমাত্র সহচারী বলিয়া জান। তিনি আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যাইবেন, আমরা সেই দিকেই গমন করিব; ইহাতে আমাদের হাত কিছুই নাই।

যে যেমন, তাহার সহিত ঠিক তেমনটি না হইতে পারিলে তো আর তাহার মন ভুলানো যায় না, তাই দুষ্টগণ তাঁহাদের সুরেই সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিল,—"আহা অবধান! যা ব'লে, ঠিকই কথা। এ সংসারে সঙ্গী আবার কে কাহার? সেই সকল-জীবের প্রাণমণি রঘুবংশ-শিরোমণি রামচন্দ্রই সকলের একমাত্র সঙ্গী। তিনি তোমাদেরও সঙ্গী, আমাদেরও সঙ্গী। তা উত্তম কথা, তিনিই সকলের সঙ্গী থাকুন, আমরা একজোট হ'য়ে আনন্দ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে তাঁহার ধামে চ'লে যাই।"

কপটীদের ছলনাময় বাক্যে পতি-পত্নী ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা তাহাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ পাতাইয়া এক-পরিবারের মত আনন্দ করিতে-করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমেক্রমে তাঁহারা এক অগম্য বনে গিয়া প'ড়িলেন। দুষ্টেরা দেখিল,—আর যায় কোথা, ঠিক ঠিকানায় আসা গিয়াছে; এইবার নিজমূর্ত্তি ধরা যা'ক্। তাহাদের সে আনন্দ-উল্লাস দ্যাখে কে? কেহ বলে,—ওহে, বা'র কর খাঁড়াখানা, টক্ ক'রে বেটার মাথাটা কেটে ফেলা যা'ক্

কেহ বলে,—উপ্‌ড়ে ফেল বেটার জীবটা। কেহ বলে,—দাও শালার চোখ দুটো উপ্‌ড়ে। কেহ বলে,—নাও, হাতে-পায়ে বেঁধে মিন্‌সেটাকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দাও—বুকে পাথর চাপিয়ে দাও, দু'চার দিনেই অক্কা পেয়ে যাবে; তারপর ও'র টাকাকড়ি যা আছে আর ঐ মেয়েমানুষটা নিয়ে স'রে পড় আর কি, অনেক দিন মজা লুটা যাবে এখন।

দুর্জ্জনগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া নারায়ণদাসের হাতে-পায়ে বাঁধিয়া ফেলিল এবং বেদম মারিতে-মারিতে দুর্গম বনে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিল। তাহাতেও হইল না; তাহারা তাঁহার বুকের উপর বড়বড় পাথর চাপাইয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল,—নাও, এইবার এইখানে প'ড়ে-প'ড়ে পরম সুখে তীর্থ কর আর কি?

প্রহারে-প্রহারে নারায়ণদাসের শরীর জর্জ্জরীভূত। নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা নাই। বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত। হৃদয়ের স্পন্দনও তেমন অনুভূত হয় না। তিনি কেবল অন্তরে-অন্তরে সেই অন্তরবিহারীর করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। কেবলই মনেমনে বলিতেছেন,—

"বোলে—জগত-চিন্তামণি। নমঃ কোদণ্ড-কাণ্ড-পাণি॥
নমস্তে নীলঘন-মূর্ত্তি। নমঃ জানকীদেবী পতি॥
নমস্তে ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর। সংসার তোর খেলঘর॥
চর অচর আদি করি। সকল ঘটে অচ্ছ পূরি॥
তুম্ভ উদরে এ সংসার। তু অচ্ছু অন্তর-বাহার॥

ত্মোর বাহারে অন্যজনে। অচ্ছি কে মো জীব রক্ষণে ॥
তু নাথ যাহা তাহা কর। অন্য শরণ নাহিঁ মোর ॥”

ওহে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি—ধনুর্ব্বাণপাণি! তোমায় নমস্কার। ওহে নীল-নীরদ-মূর্ত্তি—জানকীপতি! তোমায় নমস্কার নমস্কার। ওহে ত্রিলোকনাথ! এ সংসার তো তোমার ক্রীড়াকুট্টিম;—চর অচর সকলের অন্তরেই তুমি বিচরণ করিয়া থাক,—সকল ঘটেই তুমি পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই সংসার তোমার উদরমধ্যে অবস্থিত,—তুমিও ইহার অন্তরে বাহিরে। হে অচিন্ত্যবৈভব ভগবন্! সেই তুমি ছাড়া আর কে-ই বা আমার জীবন রক্ষণে সমর্থ হইবে? নাথ! তোমার যাহা ইচ্ছা কর;—রাখিতে হয় রাখ, মারিতে হয় মার, আমার কিন্তু তুমি ভিন্ন অন্য শরণ নাই, জানিও।

নারায়ণদাসকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া দুষ্টগণ মনে করিল,—আপদ চুকিয়াছে—লোকটা মরিয়া গিয়াছে। এইবার তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার পত্নীকে আসিয়া আক্রমণ করিল। আহা, পতির দুর্গতি দেখিয়া মালতী আশ্রয়তরুর অঙ্কচ্যুতা লতিকার মত ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ এই অবস্থায় তাঁহাকে যাইয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। সুন্দরীর সুষমার নেসায় সকলেই বিভোর,—সকলেই জ্ঞানহারা। ইন্দ্রিয়-কিঙ্করগণ সেই অপ্রাকৃত রূপ যতই দেখিতেছে, ততই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের আর অপেক্ষা সহিল না; সেই অবস্থাতেই তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। নারকীগণের মুখে আর কোন কথাই নাই,

কেবলই বলে,—চল গো রসবতি! আমাদের সঙ্গে চল;—তোমার ভয় কি—ভাবনাই বা কি? তোমার এক পতি গিয়েছে; দশ পতি মিলেছে;—উঠ গো সুন্দরি! উঠ।

তাদের সে আদর-কদর দ্যাখে কে?—সে যেন ভাদরের বাদরের মত মালতীর উপর ঝর-ঝর বরষণ হইতে লাগিল। কিন্তু সে কথা শোনে কে?—মালতী তো আর ইহ রাজ্যে নাই! তিনি যে মনেমনে সেই মনোনায়কের চরণপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

একে ভক্ত নারায়ণদাসের বিপদ, তাহার উপর সতীর বিপদে বিপদভঞ্জন বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আধার চঞ্চল হইলে আধেয়ও চঞ্চল হয়। ভগবানের চাঞ্চল্যে তাঁহার চরণার্পিত মালতীর চিত্তও চঞ্চল হইয়া পড়িল। অমনি তিনি সে রাজ্য হইতে আবার এ রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সংজ্ঞা হইল। কদাচারীদের আচরণ দর্শনে ঘৃণায়-লজ্জায় তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। ভয়ে ও রোষে শরীর থরথর কাঁপিয়া উঠিল। নয়নে দরদর অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। কামুকগণের কুৎসিত প্রস্তাব যেন বজ্রের মত তাঁহার কর্ণে বিষম বাজিতে লাগিল। তাই তিনি দুইটি হস্তে দুইটি কর্ণ চাপিয়া ধরিলেন এবং আর যেন তাহাদের মুখ দর্শন করিতে না হয়—এই ভয়ে নয়ন মুদিয়া সেই মুদির-বরণ জানকী-রমণকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন।—

"বোইলা—আহে মহাবাহু। শরণপঞ্জর বোলাউ॥
পুরাণপথে অছি শুনি। আতঙ্গকালে রঘুমণি॥
মথিবে বোলি ধনু শর। ধরিণ অছ বেনি কর॥"

ওহে ও মহাবাহু! তুমি না আপনাকে শরণাগতের প্রতিপালক বলিয়া পরিচয় দাও? হায়, পুরাণপথে শুনিতে পাই;—রঘুমণি তুমি না-কি বিপৎকালে রক্ষা করিবে বলিয়া যুগল্ করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া আছ? কই,—কই সে তুমি? শরণাগতের শরণদাতা কই সে তুমি?

এইরূপ কাতর উক্তি করিতে-করিতে সুন্দরী সুদূরাগত অশ্ব-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। অমনি তিনি পাগলিনীর মত আলু-থালু ভাবে উঠিয়া ইতস্তত দৃষ্টি চালন করিতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে দেখিলেন,—দূরে বহুদূরে কে একজন শ্বেতবর্ণ অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে আসিতেছেন। নয়নের পলক না পালটিতে-পালটিতে ঝলকে-ঝলকে বিজলীর দীপ্তি ছড়াইতে-ছড়াইতে সেই অশ্বারোহী দস্যুনিপীড়িতা মালতীর অগ্রভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে যেন ক্ষত্রিয়,—বেশ বড়ই বিচিত্র;—

"সুবর্ণমুকুট মউলি। দ্বিতী সূর্য্যার প্রায় ঝলি॥
শ্রবণে মকরকুণ্ডল। লুলই বেনি গণ্ডস্থল॥
কণ্ঠে কৌস্তুভমণি-হার। স্বরূপে জনমনোহর॥
হৃদরে পদক বিরাজে। রত্নকঙ্কন বেনি ভুজে॥
চম্পক-কঢ়ই অঙ্গুলি। কি শোভা মুদ্রিকা-আবলি॥
ঝিণ বসন কটিমাঝে। সুরত্নমেখলা বিরাজে॥
নীল-জীমূত-কলেবর। রাজীবলোচন সুন্দর॥
রঙ্গ অধরে মন্দ হাস। গলি কি পড়ছি পীযূষ॥
কটিরে যমদাঢ় বান্ধি। শরত্রাসক্ কন্ধে ছন্দি॥

ঢালহিঁ পড়িচ্ছি পিঠিরে। চঢ়িন শ্বেতঅশ্বপরে ॥"

তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-মুকুট—ঠিক যেন আকাশছাড়া আর একটী সূর্য্য দীপ্তি বিস্তার করিতেছে। কর্ণযুগলে মকরকুণ্ডল,—গণ্ডস্থলে ঢুলঢুল ঢুলিতেছে। কণ্ঠে কৌস্তুভ-সংলগ্ন-মণির মালা। হৃদয়ে পদক। উভয় হস্তে রত্নকঙ্কন। চম্পককলির মত অঙ্গুলি। তাহার উপর সারিসারি আঙ্গুটি; শোভাই বা কত? কটিতে সূক্ষ্ম বসন, তাহার উপর রত্ন-জড়িত চন্দ্রহার। শ্যামল জলধরের ন্যায় কলেবর। কমল-কমনীয় শোভন লোচন। রঙ্গিম অধরে মন্দ হাস্য,—সে যেন সুধার ধারা গলিয়া-গলিয়া পড়িতেছে। কটিদেশে 'যমদাঢ়' নামক অস্ত্র আবদ্ধ। স্কন্ধে তূণ। পৃষ্ঠভাগে ঢাল। কড়ি ও কোমলে সে মূর্ত্তিখানি বড়ই মনোহর। মনোহর বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে সমান নয়। সেই বজ্রাদপি কঠোর মূর্ত্তি দেখিয়া দস্যুগণের মন মহা-ভয়ে অভিভূত হইল। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, তাহারা আপনাআপনি গহন বনে পলায়ন করিল। কে যে কাহার ঘাড়ে পড়ে, কিছুই ঠিক নাই। কেহ বা কিছু দূর গড়াইয়া-গড়াইয়াই চলিল। পড়িয়া গিয়া কাহারও হাঁটু ছিঁড়িয়া গেল; কাহারও কপাল ফাটিয়া গেল; কাহারও দন্তপাটি উপড়াইয়া পড়িল; কাঁটাখোঁচা ডাল-পালা ফুটিয়া কাহারও নাক, কাহারও চোক, কাহারও গলা, কাহারও কাণ ছিঁড়িয়া-ফুঁড়িয়া গেল। "ঐ এ'ল-রে—ধ'ল্লেরে" বলিতে-বলিতে যে যেদিকে পাইল সেইদিকেই প্রাণ লইয়া দৌড় দিতে লাগিল। কিন্তু সেই অশ্বারোহীর কুসুম-

সুকুমার রূপ দর্শনে মালতীর মন আমোদে মাতিয়া উঠিল। তিনি অনিমিষ-নয়নে সেই রূপমাধুরী প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়চূড়ামণি এইবার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। হাসিতে-হাসিতে মালতীর কাছে আসিয়া বাৎসল্যরসের সুধাসিক্ত স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হাঁগা বাছা, তোমাদের বাড়ী কোথায় গা? একলা মেয়ে মানুষ, সঙ্গে কেহ নাই, এই দুর্গম বনে যাবেই বা কোথায়? আর হাঁগা, ওই যে কয়টা লোক তোমার কাছে থেকে পালিয়ে গেল, তারাই বা কে?"

তাঁহার স্নেহ-সম্ভাষণ শ্রবণে মালতীর মনে হইতে লাগিল, আহা হা হা! এই নরকের বিষম বিষজ্বালার মধ্যে এই স্বর্গের প্রাণ-তর্পণ অমৃতবর্ষণ কে আনিয়া দিল রে? এ নিশ্চয় রঘুবীর! তোমারই করুণার লীলা।

ভাবের প্রবল আবেগে মালতী কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নয়নদ্বার দিয়া অজস্রধারে বাহির হইয়া পড়িল। তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সেই করুণাময় ক্ষত্রিয়বীরের নিকটে আদ্যোপান্ত আত্ম-কথা বিনীত ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

পতির প্রতি পাপিষ্ঠগণের নির্য্যাতনের কথা কীর্ত্তন করিতে-করিতে সতীর লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মণিহারা ফণিনীর মতন ধৈর্য্যহারা দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। কি বলেন,

কি করেন, কিছুই ঠিক নাই। অবশেষে তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে-করিতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—ওগো, "তুমি আমার কে—তা জানি না। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া দুরিত-হারী রঘুবীরই বোধ হয় তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ওগো, শুন গো শুন,—ওই পলাতক পাষণ্ডগণ আমার পতি-দেবতাকে প্রহার করিতে-করিতে কোথায় লইয়া গিয়া কি যে করিল, কিছুই জানি না। ওগো, শুন গো শুন,—ওরা আবার ফিরে এ'সে প্রকাশ্য বেশ্যার মত আমার কাছে জঘন্য প্রস্তাব করিতেছিল। এমন সময় রঘুনাথের কৃপায় তুমি আসিয়া পড়িলে, আর তোমাকে—তোমাকে দেখিয়া ওরা পলাইয়া গেল। ওগো, শুন গো শুন,—আমার পতি বোধ হয় আর জীবিত নাই। তাই আমার প্রাণের মাঝে প্রলয়ের আগুন দাউদাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দাও,—দাও চিতা জ্বালাইয়া দাও। যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ—দাও,—দাও চিতা জ্বালাইয়া দাও। সেই জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দান করিয়া অন্তরের জ্বালা জুড়াইয়া লই;—বিষে বিষের ক্ষয় হইয়া যাউক। দাও,—দাও চিতা জ্বালাইয়া দাও—জ্বালাইয়া দাও।

সতীর পতিভক্তিমাখা উক্তি শুনিয়া সীতাপতি নিরতিশয় প্রীতি-লাভ করিলেন। তাঁহার করুণায়-গলা প্রাণ আরও যেন বিগলিত হইয়া গেল। করুণার ঝরণার মত ঝরঝর করুণারসে মালতীর মন-প্রাণ সরস ও সুস্নিগ্ধ করিতে-করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"পতিব্রতে, চিন্তা নাই, চিন্তা নাই। তোমার পতি জীবিত আছেন। তোমার কথা শুনিয়া অমার মনে হইতেছে,—আসিবার পথে

দেখিয়া আসিয়াছি, কে এক জন জঙ্গলের মাঝে পড়িয়া-পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—হা মালতি, আর বুঝি অযোধ্যায় যাওয়া হইল না! নিশ্চয় তিনিই তোমার পতি হইবেন। চল, চল সতি, অধিক দূর নয়, একটু অগ্রসর হইলে তুমিও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে। চল,—তাঁহার সহিত তোমায় মিলিত করিয়া দিই।''

পতি-বিহনে পতিব্রতা মালতীর শরীর তখন যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। তাঁর যেন আর একটী পা-ও চলিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান্ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—মাতা, তুমি আমার হস্ত ধারণ কর,—আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া আইস,—ভয় নাই। তোমার মত পতিপরায়ণা সতী রমণীর কখনও পতির সহিত চিরবিচ্ছেদ হইতে পারে না। আইস,—আমার এই হস্ত ধারণ করিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া আইস। এই বলিয়া ভবভয়হারী তাঁহার অভয় হস্ত বিস্তার করিয়া দিলেন। মাতৃসম্বোধন শুনিয়া মালতীর আর অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। তিনি সেই দীনবান্ধবের দয়ার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গেসঙ্গে চলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ-মধ্যেই তাঁহারা নারায়ণদাসের নিকটে যাইয়া পৌছিলেন। গিয়া দেখিলেন, তাঁহার হস্ত-পদ দুশ্ছেদ্য রজ্জুতে আবদ্ধ। বক্ষের উপর গুরুভার প্রস্তর। মুখে বাক্য নাই। শরীর নিশ্চেষ্ট ও অবশ। পতির এই দুঃখদ দশা দর্শনে মালতী যেন ধরণীতে ঢলিয়া পড়েন-পড়েন হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ তাঁহার অভয়-নাদের দুন্দুভি-বাদ্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে-করিতে নারায়ণদাসের বক্ষ

হইতে প্রস্তরগুলি নামাইয়া ফেলিলেন এবং শাণিত অস্ত্রে বন্ধন ছেদন করিয়া দিয়া তাঁহার হস্তে ধরিয়া একবার ঝাঁকুনি দিলেন। তাহাতেই তাঁহার শরীরে যেন তড়িতের তরতর প্রবাহ প্রবাহিত হইল। ঘুমন্ত মন-প্রাণ-শরীর সকলই জাগিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখেন,—সম্মুখে সেই দিব্য ধনুর্ধারি-মূর্ত্তি, আর তাঁহার পার্শ্বে পত্নী মালতী।

ব্যাপারখানা কেমন যেন তাঁহার স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ তিনি যেন কেমন একতর হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার পূর্ব্বের অবস্থা সকলই স্মরণপথে আসিয়া গেল। অহো, সেই ভীষণ বিপদে বিপদভঞ্জন জানকীরঞ্জন ছাড়া আর কে-ই বা নিস্তার করিতে সমর্থ? ইনি-ই নিশ্চয় সেই ধনুর্ব্বাণপাণি রঘুবংশশিরোমণি, এই ভাবে গদগদ হইয়া তিনি তাঁহার চরণতলে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—ঠাকুর হে!—

"তুম্ভে মোহর প্রাণেশ্বর। তুম্ভে মো জীবর ঠাকুর॥
তুম্ভে মো বাঞ্ছাকল্পতরু। তুম্ভে সকলজীব-গুরু॥
তুম্ভে মো মুকুন্দ মুরারি। তুম্ভে মো আদিকন্দ হরি॥"

তুমিই আমার প্রাণেশ্বর। তুমিই আমার জীবনের ঠাকুর। তুমিই আমার বাঞ্ছাকল্পতরু। তুমিই সকল জীবগণের গুরু। তুমিই আমার মুকুন্দ মুরারি। তুমিই আমার আদিমূল হরি। তা প্রভু, যদি দয়া করিয়া দেখাই দিলে—বন্ধন মোচন করিলে,

তবে আর একটু ভাল করিয়া দেখা দাও। তোমার স্বরূপ সাক্ষাৎ-কার করাইয়া ভবের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দাও।

ভক্তের কথা শুনিয়া ভক্তবৎসলের রক্তিম অধরে মন্দ-মধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। হাসির ভাবটা,—নাঃ, ভক্তের কাছে আর আমার আত্মগোপন করিবার যো নাই। স্বুবর্ণ—বালা-বাজু হার-কুণ্ডল যে কোন রূপ ধরুক না কেন, বেণিয়ার কাছে তাহার আর ফাঁকি দেওয়া চলে না। ভক্তের কাছেও আমার অবস্থা সেইরূপ। মালতী ও নারায়ণদাস আমার অকপট ভক্ত। তাহারা আমাকে দেখিবার জন্যই আমার নাম লইয়া বাটীর বাহির হইয়াছে। তাহাদের আমি আপন স্বরূপ দেখাইব না কেন? এই ভাবিয়া তিনি তাঁহাদের সমক্ষে আপনার রঘুনাথ-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই কন্দর্পবিজয়ী দিব্য রূপ দর্শনে পতি-পত্নীর নয়ন-মন ভুলিয়া গেল। তাঁহারা বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, আর গদগদ-কণ্ঠে কত কি স্তবস্তুতি করেন। কেবলই বলেন,—হায় প্রভু! তোমার প্রভুপণার বলিহারি যাই বলিহারি যাই। এই ছার মানব আমাদের জন্য তুমি অযোধ্যাপুরী শূন্য করিয়া এখানে আসিয়াছ! হায় প্রভু, তোমার মত দয়ার ঠাকুর ছাড়িয়া কেন যে লোকে অন্য দেবতা আরাধনা করিতে যায়, তাহাতো কিছু বুঝি-তেই পারি না। অহো, তাহাদের মূর্খতা কি অসাধারণ!

ভক্তের বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে, ভগবান্ বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"ওগো, তোমাদের বিমল প্রেমে আমি তোমাদের কাছে আত্মবিক্রীত হইয়া গিয়াছি। তোমরা আমার কাছে অভি-

মত বর প্রার্থনা করিতে পার,—আমি আপনাকে পর্য্যন্ত তোমা-দিগকে দান করিতে প্রস্তুত।"

পতি-পত্নী অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"নাথ, আমরা যখন তোমাকে পাইয়াছি, তখন সকলই পাইয়াছি। আর আমাদের অন্য বরে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই প্রার্থনা,—তুমি অনুক্ষণ আমাদের অন্তরের পথে বিচরণ কর,—আমরা যেন নয়ন মুদিলেই তোমার ওই দিব্য রূপ দর্শন করিতে পারি।"

ভগবান্ হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"ওগো, তাই হবে গো তাই হবে। তোমরা এখন অযোধ্যাপুরে গমন কর। সেইখানে গিয়া আমার সেবায় কালযাপন করিতে থাক। দেহাবসানে দিব্য-দেহে আমার সহিত যাইয়া মিলিত হইবে।" এই বলিয়া অন্তর্য্যামী অন্তর্হিত হইলেন। নারায়ণদাস এবং মালতীও শ্রীপ্রভুর উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করিয়া, তাঁহার মহিমা গাহিতে-গাহিতে বলদ লইয়া অযোধ্যা-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় কিছুদিনের মধ্যে নিরাপদে তথায় যাইয়া পঁহুছিলেন এবং সামান্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই সাধু-বৈষ্ণব-সেবা ও হরিভজন করিতে-করিতে শান্তিময় পুণ্য জীবন অতিবাহিত করিলেন। অন্তে শ্রীরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন। এ সংসারে তাঁহাদের আসাযাওয়ার অবসান হইয়া গেল।

বালিগ্রাম দাস।

ভাবের প্রভাব ভাবনায় আনা যায় না। সে স্বভাবের উপরও কলম চালায়। তুমি উচ্চ জাতি, উচ্চ প্রকৃতিই তোমার স্বভাব-সিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু ভাবের গুণে তুমিও নীচ হইয়া যাইতে পার;—আপনাকে একটা 'হাম বড়' ভাবিতে-ভাবিতে তুমিও নীচের নীচ হইয়া যাইতে পার। আবার ঐ নীচজাতি, নীচতাই যাহার মজ্জাগত প্রকৃতি, ভাবের গুণে সে-ও উচ্চ হইয়া উঠিতে পারে,—আপনাকে 'দীনহীন সামান্য' ভাবিতে-ভাবিতে সে-ও উচ্চের উচ্চ হইয়া পড়িতে পারে। তুমি যতই কেন উচ্চ-জাতি হও, আপনাকে বড় ভাবিতে গেলেই ভাব তোমায় ঘাড়ে ধরিয়া ছোট করিয়া দিবে, আর যতই নীচজাতি হও না কেন, আপনাকে তৃণাদপি নীচের নীচ চিন্তা করিতে পার তো ভাব তোমায় বড়র বড় মহাবড় করিয়া দিবে। ইহাই ভাবের বিচিত্র বৈভব।

ভাব এ স্বভাব পাইল কোথা হইতে,—তাহা কি আর বলিতে হইবে? ভগবান্ ভাবনিধি; ভাব তাঁহার শক্তিতেই শক্তি-সম্পন্ন। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদর-মধ্যে অবস্থিত, সেই বিশ্বম্ভর ভগবান্‌কে যিনি মস্তক-ভূষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি জাতি-বিদ্যায় কুলে-শীলে ধনে-মানে যতই কেন বড় হউন, তাঁহার আর মস্তক উন্নত করিবার যো নাই। গিরিধারীর অসাধারণ গুরুতায়

তাঁহার মস্তক আপনাআপনি অবনত হইয়া পড়ে,—তিনি আপনাকে ধরণীর ধূলিকণার অপেক্ষাও নগণ্য মনে করিয়া বিশ্ববাসী সকলেরই চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইতে থাকেন। আর যেখানে ভাবনিধি ভগবান্ নাই, এ ভাবও সেখানে নাই। বর্ণবহির্ভূত মূর্খ নির্ধন ও নির্গুণ হইলেও সে আপনাকে কি একটা মস্ত প্রকাণ্ড বলিয়া মনে করে। করিবারই কথা; তাহার মাথায় তো আর বিশ্বম্ভরের গুরুভার নাই? সে ভিতর-ফাঁকা—খালি খানিকটা ধোঁয়া-পোরা ফানুসের মত শূন্যেশূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। আবার সেই নীচ মূর্খ দুর্জাতিই যদি কোন ভাগ্যবলে আপনার ভিতর ভগবান্‌কে আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির অন্যরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। সে-ও তখন ভিতরেভিতরে কি-একটা ভারি-ভাব অনুভব করিয়া ফলভারবিনম্র বৃক্ষের মত অবনত হইয়া পড়ে।

এই দেখ না কেন, দাসিয়া বাউরী, সে তো খন্দাল জাতি—একরূপ শবরজাতি বলিলেই হয়, ব্রহ্মাণ্ডপতিকে অন্তরে ধরিয়া সে কি কাণ্ডকারখানাটাই না দেখাইল? তাহার সেই দেব-দুর্লভ ভাবের কথা ভাবিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কেবলই মনে হয়,—বলিহারি ভাবনিধি ভগবান্, আর বলিহারি তাঁহার ভাবের প্রভাব!

বালিগ্রাম শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। দাসিয়া বাউরির নিবাস সেই গ্রামে। সে বড় দরিদ্র। পুত্র নাই, কন্যা নাই। মাত্র এক পত্নী। দুইজনে কাপড় বুনিয়া কোন রকমে দিন গুজরাণ করে। সাধারণত বাউরীদের যেরূপ আচার-ব্যবহার

হইয়া থাকে, দাসিয়ারও আচার-ব্যবহার প্রায় সেই প্রকার। কিন্তু তাহার ভগবানের নাম-গান শ্রবণ করিবার একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল। গ্রামের মধ্যে কাহারও ঘরে কোন ব্রত-উৎসব-উপলক্ষে যদি কখনও নামসঙ্কীর্ত্তনাদি হইত, সে তথায় গিয়া দূরে রহিয়া তাহা শ্রবণ করিত। সে গানের ভাব-অর্থ কিছু বুঝিত না, কিন্তু কি-জানি কেন সে তাহাতে কি এক সুখ পাইত, সেই সুখের লোভেই সে হরিলীলা-গান শুনিতে যাইত।

এইরূপে কিছুদিন যায়. শ্রুতিমূলে হরি-গীতি প্রবেশ করিতে-করিতে তাহার অন্তরের অপবিত্রতা দূর হইয়া গেল,—দিব্য-জ্ঞানের নির্ম্মল আলোকে অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে গুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিল। গলায় তুলসীর মালা পরিল। দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া হরি-পূজা করিতে থাকিল এবং আনন্দ-মনে সজ্জনের সনে হরিগুণ গাহিয়া-শুনিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে তাহার নির্ম্মল মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—পাপ পুণ্য এই উভয়ই বন্ধন,—উভয়ই কিছুই নয়। সুখ-দুঃখ কেবল নামে ভেদ, বাস্তবিক এ দুই-ই সমান। তাই তাহাতে সমভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। সে সর্ব্বদাই কি এক সুখের নেশায় নিমগ্ন হইয়া থাকে। আহার-আদির আর বড় চেষ্টাচরিত্র নাই। যথন যাহা জুটিল, তথন তাহাই খাইল। যে চিন্তার চিতানলে জীবিত মানব ধিকিধিকি পুড়িয়া ছারখার হইয়া থাকে, সে চিন্তা যেন তাহার অন্তরের প্রান্তসীমাতেও নাই। তাহার কেবল একমাত্র চিন্তা,—হায় বিধাতা! তুমি আমায় নীচ

জাতিতে জন্ম দিলে, আমি সেই সুদুর্ল্ভা হরিভক্তি বুঝি পাইব না,—শ্রীহরির দেব-বন্দিত পাদপদ্ম বুঝি পাইব না! হায় হায়! বৃথাই আমার ভবে আসা হইল।

বালিগ্রাম এবং পুরুষোত্তমধাম একরূপ পাশাপাশি। দুই ক্রোশ ব্যবধান আর কতটুকু? সেই পুরুষোত্তমধামে প্রতিবর্ষে মহাসমারোহে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা হইয়া থাকে। কত দূর-দূরান্তরের লোক আসে, কিন্তু দাসিয়া বাউরী একবারও তাহা দেখিতে যায় নাই। শ্রীক্ষেত্র-অভিমুখে রথযাত্রা-দর্শন-উপলক্ষে দলেদলে যাত্রীর দল যাইতে দেখিয়া এবার তাহার মনে কেমন সাধ হইল,—ভাল, আমিও একবার দারুহরিকে দর্শন করিয়া আসি না কেন? হায় হায়! আমার কি আর সে সৌভাগ্য ঘটিবে? আমি কি এ চর্ম্ম-নয়নে চক্রধারী শ্রীহরিকে দেখিতে পাইব? চিত্তে এইরূপ বিচার করিয়া সে যাত্রিগণের সহিত নীলাচলধামে গমন করিল। যাইয়া দেখে, শ্রীজগন্নাথ নন্দীঘোষ-রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সকলের মুখেই জয়জয় হরিহরি ধ্বনি। হাজার হাজার লোক নাচিতেছে, হাজার হাজার লোক গাহিতেছে, হাজার হাজার লোক বাজনা বাজাইতেছে, হাজার হাজার লোক রথের রজ্জু ধরিয়া টান দিতেছে। সেই উল্লাসময় দৃশ্য দেখিয়া দাসিয়ার মন আনন্দ-রসে রসিয়া গেল। সেই রস টস্ টস্ করিয়া নয়ন-দ্বার দিয়া ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে এক-একবার মস্তকের উপর যুগল হস্ত বিন্যস্ত করিয়া প্রভুর অমিয়-মাখা

শ্রীমুখখানি দর্শন করে, আর 'জয়জয় জগন্নাথ' বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। শ্রীপ্রভুর বিদ্রুম-বিনিন্দিত রক্তিম অধর এবং কৃষ্ণতারক-শোভিত শোভন নয়ন দেখিয়া সে ভাব-বিভোর হইয়া পড়িল। সে দেখিল,—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীহরি যেন মৃদু-মধুর হাস্য করিতে-করিতে তাহার প্রতি করুন-নয়নে চাহিতেছেন। সে আর থাকিতে পারিল না। অমনি দু'বাহু তুলিয়া গদগদ-কণ্ঠে প্রভুর উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—পতিতপাবন হে! যদি দয়া করিয়া দেখিতেছ, দেখ—আমার মত পতিত আর নাই। যদি তোমায় পতিতপাবন-নামই ধারণ করিতে হয় প্রভু, তবে অগ্রে এ পতিতকে উদ্ধার করিয়া পরে ঐ নাম ধারণ করিও। ছাখ, ছাখ প্রভু, আমার মত মহানারকী, মহাপাতকী আর দেখিতে পাইবে না। দয়াময়! আমিই তোমার দয়া প্রকাশের প্রকৃত পাত্র। আমার প্রতি আর অবহেলা করিলে চলিবে না। অধমকে তোমায় উদ্ধার করিতেই হইবে। দাও—দাও প্রভু! আমার পাপ-তাপ দূর করিয়া দাও। দাও—দাও প্রভু! আমার হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়া দাও। তাহার আলোকে আমার অন্তর-বাহির আলোকিত হইয়া উঠুক। আর সেই আলোকে তোমার ঐ ত্রিভুবন-আলোকরা কমনীয় মূর্ত্তি অনুক্ষণ দর্শন করি। এই বলিয়া সে বারংবার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, আবার উঠিয়া মস্তকে যুগল হস্ত রাখিয়া বিনয়-বচনে কত কি বলে, আর তৃষিত-নয়নে সেই অপ্রাকৃত রূপসুধা পান করে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিবার পর সে যেন প্রাণেপ্রাণে প্রাণনায়কের আশ্বাসের ভাষা

শুনিতে পাইল। আর প্রভুর নিকট 'মেলানি' (বিদায়) লইয়া একলাএকলা চলিয়া আসিল।

দাসিয়া বাটী আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার প্রেয়সী হাসিয়া-হাসিয়া বলিল,—এই যে, রথযাত্রা দেখিয়া আসিয়াছ যে? বেশ করিয়াছ। তা এখন এক কার্য্য কর, অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছে, হাত-পা ধুইয়া আহার করিতে ব'স। দাসিয়ার তখন ভাবের নেশা ছুটে নাই। সে আর কোন কথা না কহিয়া হাত-পা ধুইয়া খাইতে বসিল। সেদিন তাহার পত্নী করিয়াছে কি,—নূতন হাঁড়ীতে করিয়া ভাত রাঁধিয়াছে। ভাতে-ফেনে একটী হাঁড়ী টাইটুম্বুর। হাঁড়ীর কানায়কানায় ফেন। ফেনের উপর সর পড়িয়া গিয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলে কতকটা শাক দিয়া, সে সেই হাঁড়ীটী পতির সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিল। চারিদিকে হাঁড়ীর টকটকে রাঙ্গা ধার, তাহার পর কতকটা সাদা ফেনের সর, আর তার মধ্যভাগে কাল শাক ঠিক গোল হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দাসিয়া ভাবের ঘোরে এই শাকান্ন দেখিয়া যেন আর কি দেখিয়া ফেলিল। সে দেখিল,—অহো, এ যে সেই শ্বেতপদ্ম-ডোলা,—এ যে সেই বিশ্ববিমোহনের শ্বেত-পদ্মনয়ন! অহো, এই সেই নয়নের রক্ত-প্রান্ত। এই সেই নয়নের শুভ্র অবকাশ। এই সেই নয়নের কৃষ্ণবর্ণ তারকা। হায়, এই সেই প্রভুর প্রফুল্ল-পঙ্কজ-নয়ন! মরিমরি নয়নের কি শোভা রে! এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে ভাবের আবেগে দাসিয়ার শরীর থরথর কম্পিত হইতে লাগিল। বদনে আর

বচন বাহির হয় না। নয়নের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রেমের জল বাহির হইয়া পড়িল। অঙ্গেঅঙ্গে রোমাবলী উত্থিত হইল। এই ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাহার পর সে বাতুলের মত আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। কাহাকে যে কি বলে, কিছুরই ঠিক নাই। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা হাততালি দিয়া ঢলিয়া-ঢলিয়া নানা রঙ্গে নাচিতে থাকে। দাসিয়ার অবস্থা দেখিয়া তাহার-পত্নীর বড় ভয় হইল। সে ভাবিল,—এ নিশ্চয় কেহ আড়ি করিয়া তাহার পতিকে 'গুণগান' কিছু করিয়াছে। তাই সে মহা হাঁকডাক করিয়া রাজ্যের লোক জড় করিল। সকলকেই বলে,—ওগো, তোমারা দ্যাখ গো, আমার স্বামী সবে এই শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিল, কোন্ অভাগা বা অভাগী আমার মাথা খাইয়া কি ক'ল্লে গো কি ক'ল্লে। ঐ দ্যাখ গো ঐ দ্যাখ, পাগলের মত আবোলতাবোল কত কি ব'কৃছে—নাচছে, গাইছে, কত কি ক'রছে। আমি এখন কি করি?—তোমরা ব'লে দাও গো ব'লে দাও।

এই কথা শুনিয়া কয়েকজন লোক রমণীকে আশ্বস্ত করিয়া দাসিয়ার দেহ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতেদিতে বলিতে লাগিল,—ও দাস, দাস! ভাত-টাত না খেয়ে এত নাচুনি-কুঁদুনি হ'চ্ছে কিসের জন্য? কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দাসিয়া যেন কোন্ রাজ্য হইতে এ রাজ্যে আসিয়া পড়িল। চমকভাঙ্গা হইয়া উত্তর দিল,—অ্যাঁ। তখনও তাহার উপর অবিশ্রান্ত প্রশ্ন চলিতে-ছিল। সে দীন হীন কাঙ্গালের মত কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের

কাছে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—ওগো, তোমরা কি বল গো কি বল,—খাবার কথা কি বল গো কি বল? রথারূঢ় জগন্নাথের ঐ পদ্ম-নয়ন তোমরা দেখিতে পাইতেছ না কি? আহা আহা,—ঐ যে তাহার রক্তপ্রান্ত,—ঐ যে তাহার শুভ্র অবকাশ, ঐ যে তাহার কৃষ্ণবর্ণ কণীনিকা! আহা আহা, কি সুন্দর কি সুন্দর! এইরূপ বলিতে-বলিতে সে আবার ভাবের আবেশে অবশ হইয়া পড়িল। আবার সেই উন্মত্তের মত নাচিতে-গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দাসিয়ার নিবাসে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ সকল রকমই ছিল। বিশেষত সেদিন রথ-যাত্রা, তাই অনেক সাধু-সজ্জন বালিগ্রাম দিয়া যাতায়াত করিতে-ছিলেন। এই লোকসংঘট্টের মধ্যে সেইরূপ মহাত্মাও কেহ-কেহ ছিলেন। তাঁহারা দাসিয়ার এই ভাব দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গেলেন। বলিলেন,—ওহে বাউরি, তোমার বিমল ভাবের বালাই লইয়া মরিয়া যাই! এ ভাব তুমি পাইলে কোথা হইতে? নিশ্চয়ই তুমি শ্রীহরির মন হরিয়া এই ভাব-রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছ। ধন্য, ধন্য তুমি! আজ তোমাকে দেখিয়া আমা-দের বড় আনন্দ হইল। আজ হইতে তোমার নাম হইল—"বালিগ্রামদাস।" এ বালিগ্রাম তোমাকে বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। আর মাতা দাসপত্নি! তুমি পতির নিমিত্ত চিন্তা করিও না। বহু ভাগ্যে তুমি এমন পতি পাইয়াছ। উপ-স্থিত তুমি এক কার্য্য কর,—এই হাঁড়ি হইতে শাকটুকু তুলিয়া

একটা কিছুতে রাখ এবং অপর একটী হাঁড়ীতে পেজপাদি (ফেন) প্রভৃতি ঢালিয়া দাও। তাহা হইলেই তোমার স্বামী এখনই আহার করিবে। জগন্নাথের জলজ-নয়ন যাহার মনে-মনে জাগিয়া আছে, সে কি কখনও ঐ ভাবের ঐ অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? আহা মাগো! ঐ দেখিতেছ না কি,—

"হাণ্ডী স্থরঙ্গ পেজ ধলা। তা মধ্যে শাগ দিশে কলা॥
সাক্ষাতে পদ্মডোলা সেহি। গোলি কিরূপ খাইবই॥"

ঐ যে লাল হাঁড়ীর কানা, তার পর ঐ সাদা ফেন, তার মধ্যে ঐ যে কালো শাক দেখা যাইতেছে, ও যে সাক্ষাৎ শ্রীহরির পদ্মনয়ন-সদৃশ; ও কি গুলিয়া খাইতে পারা যায় মা? এ বড় কঠিন রোগ মা! কঠিন রোগ। এই রোগের প্রাবল্যেই শ্রীমতী রাধিকা তমালতরু আলিঙ্গন করিয়া বিভোর হইয়া থাকিতেন,—বাঁশেবাঁশে ঘষাঘষীর ধ্বনি শুনিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেন। এ সেই জাতের রোগ মা! সেই জাতের রোগ! এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দাসপত্নীও তাঁহাদের আদেশ অনুসারে শাক ও ফেন পৃথক্ পাত্রে বাড়িয়া দিলেন। তার পর পতিকে মিনতি করিয়া আহার করিতে বলায় তিনিও বিনা আপত্তিতে ভোজন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দিন হইতে দাসিয়ার ভাবই আর এক প্রকার হইয়া গেল। দিন নাই—রাত্রি নাই, কেবলই ভাবনা,—সেই ঘণ্টা-নিনাদ-মুখরিত নন্দীঘোষ রথ, রথোপরি সেই জগন্নাথ, তাঁহার সেই সুধার সদন রসের বদন, আর সেই তাপনাশন সরোজ-নয়ন। সে বাহিরে যে কোন কর্ম্মই করুক

না কেন, মন সেই মনোনায়কের চরণতলে রাখিয়া দিয়াছে। অনুক্ষণ মনে করে,—সে যেন সেই দীনবন্ধুর অভয়-পাদপদ্মতলে মস্তকটী রাখিয়া নির্ভয়ে শুইয়া আছে। এই ঘুমের ঘোরেই যেন সতত বিভোর। নয়ন যেন সর্ব্বদাই ঢুলু ঢুলু।

একদিন রাত্রিকালে বালিগ্রামদাস শয়ন করিয়া আছে। চিত্ত চিন্তামণির চরণকমলে সমর্পিত। প্রাণটা কেমন আন-চান করিয়া উঠিল,—হায় সেই শঙ্খচক্রধারী দারুহরির কৃপা অধিকার করিতে কখনও পারিব কি?—তাঁহার দর্শনলাভ ভাগ্যে কখনও ঘটিবে কি? উৎকণ্ঠায় তাহার যেন কেমন একটা ছটফটানি ধরিল। সে যেন আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, দর্শনলাভের ক্ষণিক বিলম্বও যেন অসহ্য—অসহ্য। জাতি নয়, কুল নয়, সৎপ্রতিষ্ঠা সদাচারও নয়, কেবল প্রাণভরা ব্যাকুলতাকেই যিনি আপনাকে পাইবার একমাত্র মূল্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি তিনি মোহন-বেশে ভক্তের পাশে চিরবিক্রীতের মত আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মঞ্জু মঞ্জীর-সিঞ্জিতে বালিগ্রাম-দাসের আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল। সে চকিত-নয়নে চাহিয়া দেখে,—তাহার সাধনের ধন, কমলারমণ হাস্য-বদনে দাঁড়ায়ে আছেন। অনেক দিনের পিপাসা; নেত্ররন্ধ্রে সে রূপসুধা পীইয়া পীইয়া সাধ আর মেটে না। অনেকক্ষণ দর্শনের পর সে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুকে বলিতে লাগিল,—দয়াময়! রথে তোমায় যে দিব্য মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম, আজ আমি সাক্ষাতেও তোমায় সেই মূর্ত্তিতেই

দর্শন করিতেছি। না, তুমি যথার্থই কাঙ্গালের ঠাকুর বটে। সুর-অসুর গন্ধর্ব্ব-কিন্নর যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র প্রভৃতিও যাঁহার দর্শন পান না, সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর তুমি কি না জ্ঞানহীন ভক্তিহীন হীনজাতি আমার গৃহে আগমন করিলে? আমি তোমায় কি দিয়া সৎকার করিব প্রভু? দাসের কথা শুনিয়া পীতবাস সহাস্য-সম্ভাষণে বলিলেন,—

"স্বর্গাদি অপবর্গ যেতে। কেবে ন রসে মোর চিত্তে॥
ভকতিভাবে যে ভজই। মো মন তা ঠারে রিঝই॥
তেনু তো ভাব মোর মূল। হে ভক্ত! মাগি ঘেন বর॥"

প্রিয়তম! স্বর্গ বল, অপবর্গ বল, অন্য কাম্য যাহা কিছু বল, এ সকলের জন্য যাহারা আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, তাহারা কিছুতেই আমার অন্তরকে প্রীতি-বিগলিত করিতে পারে না। কিন্তু অকপট ভক্তিভাবে যে আমার ভজনা করে, অমার মন তাহার জন্য ঝুরিয়া মরে। তাই তোমার বিশুদ্ধ ভাবই আমার মূল,—সেই ভাবের আকর্ষণেই আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভক্ত হে, তুমি আমার নিকট অভিমত বর মাগিয়া লইতে পার।

চিন্তামণি যাহার হস্তগত, সে আর সামান্য সামগ্রী কি-ই বা প্রার্থনা করিবে? তাই বালিগ্রামদাস আনন্দভরে প্রভুর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বলিল,—

"পদ্ম-চরণ তুম্ভ ভাবি। কোটিএবার লুচ্ছি যিবি॥
বরে মো প্রয়োজন নাহি। এতেক দেব ভাবগ্রাহি॥

তো ভক্তমানঙ্ক চরণে। মো মন থাউ অনুক্ষণে ॥
যেবে মুঁ মনরে ভাবিবি। তুম্ভ দর্শন পাউথিবি ॥
এ বর মোতে আজ্ঞা হেউ। অধিক লোড়া নাহি আউ ॥”

আই আই, আমি তোমার চরণকমল চিন্তা করিতে-করিতে কোটিকোটিবার তোমার বালাই লইয়া মরিয়া যাই। তোমার কাছে আমার অপর বরে আর প্রয়োজন নাই। তবে যদি নিতান্তই কিছু দিতে চাও—তবে ভাবগ্রাহি হে, ইহাই দিও,—যেন তোমার ভক্তগণের চরণে আমার মন অনুক্ষণ বিচরণ করে, আর আমি যখন মনেমনে তোমার ভাবনা করিব, তখন যেন তোমায় দেখিতে পাই। ইহার অধিক কামনা করিবার আমার কিছুই নাই।

ভক্তের প্রীতি-মাখা প্রার্থনা-বাক্যে ভগবান্ পরম প্রীতি-লাভ করিলেন। প্রসন্ন-বদনে বলিলেন,—ওহে বালিগ্রামদাস! তোমার জীবন ধন্য। এরূপ কামনাশূন্য পুণ্য-মন বড় দেখা যায় না। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। তুমি যখন নীলাচলে গমন করিবে, আমি আমার দেউলের নীলচক্রের উপর অব-স্থান করিব। তুমি আমায় যে রূপে দেখিতে ইচ্ছা করিবে, আমি সেই রূপেই তোমাকে দেখা দিব। আর তুমি আমায় যে কোন দ্রব্য আহার করিতে দিবে, তাহা আমি অবশ্যই ভোজন করিব। এই বলিয়া হাসিতে-হাসিতে শ্রীহরি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

দীনতাই ভক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভক্ত স্বভাবত আপনাকে

নীচের নীচ—অতি নীচ মনে করিয়া থাকে। দাসিয়া বাউরী একে আপনাকে অতি নীচ জাতি বলিয়াই জানিত, তাহার পর ভগবানের ভক্তি-সম্পত্তি অধিকার করিয়া সে যে আপনাকে কত নীচের নীচ মনে করিত, তাহা বলা যায় না। তাই সে ভগবান্‌কে—প্রাণের ঠাকুরকে কিছু খাওয়াইব খাওয়াইব মনে করিলেও মুখ ফুটিয়া সে কথা তাঁহার নিকট বলিতে পারে নাই। কেবল নয়নে দেখিবার বাসনাই জানাইয়াছিল মাত্র। অত্যধিক দীনতাই তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সে না বলিলেও কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান্ তাহার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি আপনাআপনিই বলিয়া উঠিলেন যে,—তুমি আমাকে যাহা কিছু খাইতে দিবে, আমি তাহা অবশ্যই ভোজন করিব।

ভগবানের কথা শুনিয়া বালিগ্রামদাস কেবলই ভাবে,—অহো, করুণাময়ের কি অপার করুণা! আনন্দে-আনন্দেই তাহার রজনীর অবসান হইয়া গেল। প্রাতঃকালে উঠিয়া কেবলই চিন্তা—প্রভুকে কি খাওয়াই—কি খাওয়াই। সে একখানি কাপড় বুনিয়াছিল। সেখানি বিক্রয় করিতে এক বিপ্র-গৃহে গমন করিল। ব্রাহ্মণ বস্ত্রখানি লইয়া মূল্য আনিতে বাটীর মধ্যে গিয়াছেন; বালিগ্রামদাস তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে। সে দেখিল—সুন্দর একটী নারিকেল গাছ। বেশি উচ্চ হয় নাই। তাহাতে সুন্দর একটী নারিকেল ফলিয়াছে। ফলটী দেখিয়াই তাহার প্রাণনাথের কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিল,—

আহা, এই নারিকেলটী যদি পাই তো তাঁহাকে আদর করিয়া আহার করাই। এমন সময় ব্রাহ্মণ বস্ত্রের মূল্য লইয়া বাহিরে আসিলেন। বালিগ্রামদাস তাঁহাকে মহা আগ্রহের সহিত বলিল,—ঠাকুর! আপনার ঐ নারিকেল ফলটী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে দান করুন। বরং উহার যাহা মূল্য হয় বস্ত্রের মূল্য হইতে তাহা কাটিয়া লউন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তা-ও কি হয়? আমার এই প্রথম গাছের প্রথম ফল; একি যাকে-তাকে দেওয়া চলে? তিনি বলিলেন বটে, কিন্তু নারিকেলটী দিলে কাপড়ের দাম যে কিছু কম দিতে হইবে, এ কথাটা মনেমনে চিন্তা করিতেও লাগিলেন। বালিগ্রামদাসেরও আগ্রহ-প্রকাশের সীমা নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন,—ভাল, নারিকেলটী না হয় তোমাকেই দিলাম, কিন্তু তুমি ইহার মূল্য কত দিতে পার বল দেখি? বালিগ্রামদাস বলিল,—ঠাকুর, মূল্য তো আপনারই নিকটে রহিয়াছে, উহার মধ্য হইতে যত ইচ্ছা লইতে পারেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—সুযোগ মন্দ নয়। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন,—তা বাপু, ফলটী তো আমার দিবারই ইচ্ছা নাই; তবে তুমি নিতান্ত জিদ করিতেছ, কি করি, তুমি এক কাজ কর, তুমি কাপড়খানির মূল্য ছাড়িয়া দাও, বিনিময়ে ফলটী লইয়া চলিয়া যাও। বালিগ্রামদাস বলিল,—আচ্ছা হউক,—তাহাই হউক, আপনার কাপড়ের মূল্য দিয়া কাজ নাই, নারিকেলটী আমাকে আনিয়া দিন। ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নারিকেলটী পাড়িয়া আনিয়া দাসিয়াকে দিতে গেলেন। সে

বলিল,—ঠাকুর! কৃপা করিয়া একটু অপেক্ষা করুন। আমি স্নান করিয়া আসিয়া ফলটী লইয়া যাইতেছি। ব্রাহ্মণের বাটীতেই পুষ্করিণী। দাসিয়া তাহাতেই স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে সেই ফলটী গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার তখন আনন্দ দ্যাখে কে? মনের মত ফল মিলিয়াছে, এইবার যাই, ইহা প্রভুকে খাওয়াইয়া আসি, এই ভাবিয়া সে দেউলের দিকে দ্রুতগতি চলিল। সে একবারও ভাবিল না—করিলাম কি? বস্ত্রখণ্ডের মূল্য না লইয়া দুইটী প্রাণীর জীবিকাকে বিপন্ন করিলাম?

প্রকৃত কথা বলিতে কি,—দাসিয়া প্রতিদিন যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা পায়—তাহা হইতেই সে আবার সূতা ক্রয় করে এবং লাভের পয়সায় খাওয়া-দাওয়া সকল ব্যয়ই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভালবাসা যথার্থই অন্ধ; তাই জগন্নাথের ভালবাসায় দাসিয়া দেখিতে পাইল না যে, সে বস্ত্রের মূল্য না লইয়া কাজটা করিয়া ফেলিল কি? সে উল্লাসে-উল্লাসে দেউলের দিকে চলিয়াছে। পথে যাইতেযাইতে দেখিল,—তাহারই পল্লীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীপ্রভুর সেবার জন্য পইড় (ডাব), শ্রীফল (বেল), পনস (কাঁটাল), আম্ব (আম্র), কদলী, ইক্ষু, ছেনাগুটিয়া (ছানার মুড়কি), দুধ, দহি, ঘৃত, নবাত, খই প্রভৃতি লইয়া যাইতেছেন। সে ব্রাহ্মণকে মিনতি করিয়া বলিল,—ঠাকুর, আমার একটী নিবেদন শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। আপনি যদি আমার এই নারিকেলটী লইয়া শ্রীপ্রভুকে নিবেদন করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তার আর কি? এই তো

আমি আমার সকল সামগ্রী নিবেদন করিতেই যাইতেছি, সেই সঙ্গে তোমার ফলটীও নিবেদন করিয়া দিব,— দাও। বালিগ্রামদাস বলিল,—ও-রকম একসঙ্গে নিবেদন করিলে চলিবে না। আপনি আপনার নৈবেদ্য অগ্রে নিবেদন করিয়া দিবেন, তাহার পর অধীনের ফলটীর কথা স্মরণ করিবেন। আপনি গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নারিকেলটী হস্তে লইয়া প্রভুকে বলিবেন,—ওহে পীতবাস! বালিগ্রামদাস তোমাকে এই ফলটী খাইতে দিয়াছে— গ্রহণ কর। আপনি এই বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। অপর মন্ত্র-টন্ত্র কিছুই বলিবেন না। ইহাতে যদি তিনি শ্রীহস্ত সম্প্রসারিত করিয়া আপনার হস্ত হইতে নারিকেলটী লইয়া যান, তবেই তাঁহাকে প্রদান করিবেন, নচেৎ আমার ফল আমাকেই আনিয়া দিবেন। দেখিবেন ঠাকুর, যেন এ কাঙালের কথা ভুলিয়া না যান।

দাসিয়ার সম্ভাষা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তো হাসিয়াই অস্থির। তিনি "আচ্ছা দাও দাও" বলিয়া ফলটী লইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর পাড়ার লোক, নিষ্ঠা-কাষ্ঠা আছে, লেখাপড়া জানেন, তাই তাঁহার হস্তে নারিকেলটী দিতে দাসিয়ার অবিশ্বাস হয় নাই। সে নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ওদিকে ব্রাহ্মণও শ্রীদেউলে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার আনীত দ্রব্যগুলি জগবন্ধুকে নিবেদন করিয়া দিলেন। মহাপ্রসাদ ভোজন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ পরমানন্দে বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া বাটী আসিবেন, এমন সময় দাসিয়া-বাউরীর নারিকেলের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ভাবিলেন,—ভাল, ক্ষেপাটার কথা

একবার বুঝিয়াই দেখা যাক না কেন? এই ভাবিয়া তিনি সেই নারিকেলফলটী হস্তে লইয়া গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্রীপ্রভুকে সেই ফলটী দেখাইয়া বলিলেন,—প্রভু হে! বালিগ্রামদাস এই ফলটী আপনাকে আহার করিতে দিয়াছে। আপনি যদি শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া ইহা গ্রহণ করেন, তবেই আমি আপনাকে দিতে পারিব, নতুবা আমাকে ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া নয়ন মুদিয়া প্রভুকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রভুও অমনি শ্রীহস্ত বাড়াইয়া ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে নারিকেলটী গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দমনে ভোজন করিলেন। এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার দর্শনে ব্রাহ্মণ ভাব-বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন অশ্রু-প্রবাহে পূরিয়া গেল। মনে-মনে বলিলেন,—অহো! ধন্য ভক্তের অচল অটল বিশ্বাস! অহো! ভক্ত, তুমি ধন্য! তোমার জনকজননী ধন্যধন্য! তোমার আবির্ভাবে আমাদের বালিগ্রামও যারপরনাই ধন্য! পুরুষোত্তম জগন্নাথ তোমার প্রতি প্রকৃতই প্রসন্ন। আজ আমিও তোমার ফল আনিবার সৌভাগ্যে ধন্য ও সফলকাম হইলাম।

ব্রাহ্মণের মুখে এই আচম্বিত কথা শুনিয়া দেউলের মধ্যে একটা মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। সকলেই বলে,—কি বিচিত্র কি বিচিত্র! ব্রাহ্মণ বালিগ্রামদাসের আবাসে গিয়া শ্রীপ্রভুর শ্রীহস্ত বাড়াইয়া নারিকেলটী লইয়া খাইবার কথা বলিলেন—তাহাকে শতশত ধন্যবাদও দিলেন। শুনিয়া তাহার বড় আনন্দ হইল। ব্রহ্মাণ্ডের নাথ যে নীচজনের নিবেদিত দ্রব্যও আদরে

করিয়া অঙ্গীকার করেন, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয় রহিল না। এইবার তাহার প্রভুকে যেন অধিক পরিমাণে আপনআপন মনে হইতে লাগিল। প্রভুর কাছে অগ্রসর হইতে চিত্ত যেন আর সঙ্কুচিত হয় না। একদিন সে ভাবিল,—যাই, একবার নীলাচলে যাই; তিনি যে নীলচক্রে রহিয়া প্রার্থনার অনুরূপ রূপে দেখা দিবেন বলিয়াছেন, তাহার সত্যতা একবার অনুভব করিয়া আসি। কিন্তু তাঁহার নিকট রিক্তহস্তে যাওয়াটা তো ঠিক নয়, সঙ্গে খাবার-দাবার লইয়া যাই কি? এইরূপ চিন্তা করিতেকরিতে একজন মালী তাহার দ্বারে আম্র বিক্রয় করিতে আসিল। আম্রগুলি দেখিতে অতি সুন্দর—আগাগোড়া পীতবর্ণ, কোথাও একরত্তি অন্য দাগ নাই; যেন মোম দিয়া গড়া। আকৃতিও বড়বড়। গন্ধে সেই স্থানটা যেন মাতাইয়া তুলিয়াছে। দেখিয়া বালিগ্রাম-দাসের বড় হর্ষ হইল, ভাবিল,—হাঁ, ইহাই দেবতাকে দিবার উপযুক্ত দ্রব্য বটে! সে তাহার ক্ষমতার অতীত অর্থ দিয়া দশ-পুঞ্জা (দশ-গণ্ডা) আম্র ক্রয় করিল। তাহাতেই দুইটি চাঙ্গারি ভরিয়া গেল। সে স্নানাদি সারিয়া শুদ্ধভাবে কাঁধে ভার করিয়া সেই চাঙ্গারি-ভরা আম্রগুলি লইয়া পুরী-অভিমুখে যাইতে লাগিল সে যাই দেউলের নিকটে গিয়াছে, অমনি পণ্ডার দল তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিলেন। আম্র দেখিয়া সকলেরই লোভ। কেহ বলেন,—ওহে দাস! এ আম্র আমার হস্তে দাও, আমি লইয়া গিয়া প্রভুকে খাওয়াইয়া আসিতেছি। তাঁহার কথায় বাধা দিয়া আর এক জন চক্ষু কপালে তুলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া

উঠিলেন,—ওহে! তুমি কে হে?—আম লইয়া যাইবার তুমি কে হে? প্রভুর সেবার যত কিছু দ্রব্য ভিতরে লইয়া যাইবার আমারই তো একমাত্র অধিকার, দেখি তুমি কেমন করিয়া লইয়া যাও? ওহে দাস! তুমি এই দিকে এস, ও আম্র আমাকে দাও, আমিই ভিতরে লইয়া যাইব। অপর একজন আসিয়া তাঁহার উপর মাত্রা চড়াইয়া মহা লম্ফ ঝম্ফ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—কী-ই,—কই, কাহার্ সাধ্য আছে আমার সম্মুখ হইতে এই আম্র লইয়া যায়, যাউক দেখি? ওহে দাস! তুমি ও আম্র আমারই হাতে দাও, আমি প্রভুকে খাওয়াইয়া আসিতেছি। এইরূপ তার উপর তার উপর মাত্রা চড়িতে লাগিল,—চেঁচামেচির চোটে ব্রহ্মকটাহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়া পড়িল,—আর টানাটানিতে ছেঁড়াছেঁড়িতে পড়িয়া বালিগ্রামদাস বেচারি মারা যাইতে বসিল। সে তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে যতই বলে,—ঠাকুর গো! এ আম্র আপনাদিগকে লইয়া যাইতে হবে না গো হবে না, তাঁহারা তাহাকে লইয়া ততই টানাটানি করেন। তাহার সে কথা তখন শুনেই বা কে? অনেকক্ষণ পরে তাঁহারা যখন দেখিলেন,—লোকটা কাহারও হস্তে আম্রগুলি দিল না, তখন তাঁহারা গোল থামাইয়া একজোট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ হে দাস! তুমি আম্র লইয়া আসিয়াছ প্রভুর নিমিত্ত, অথচ সেবক আমরা—আমাদের হাতে দিতেছ না; বলি, তোমার মতলবটা কি? বালিগ্রামদাস ঈষৎ হাসিতেহাসিতে তাঁহাদিগকে সেই স্বাবেক কথাই বলিল,—ঠাকুর গো! এ আম্র তো আমি

আপনাদের কাহারও হস্তে দিব না। এই কথা বলাও যা, আর অমনি পণ্ডার পাল চটিয়া লাল! মহা হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন,—কী-ই,—বেটা ছোটলোক বাউরী,—তুই এই আম্র নিয়ে ক'র্বি কি? তুই দেউলের ভিতরে যাইতে পার্বি,—না, প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁরে খাওয়াতেই পার্বি? ও-ওঃ—বেটা বাউরী, প্রভুকে খাওয়াতে আম্র এনেছে, আবার আমাদের হাতে দেবে না? দিবি না কি রে বেটা!—প্রভুকে খাওয়াতে হয় তো এই আমাদেরই পা—য়ে ধো—রে দি -তে হ—বে যে—।

বালিগ্রামদাসের সেই হাসি-হাসিই মুখ। সে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে-করিতে খানিকটা পিছাইয়া আসিল এবং স্কন্ধ হইতে ভারটি নামাইয়া নীলচক্রের দিকে নয়ন চালন করিল। চাহিয়া দেখে কি?—অহো, তাঁহার প্রাণের বন্ধু সেখানে শুভ বিজয় করিয়াছেন। দেখিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না যে, ছার বাউরীর জন্য জগতের নাথ আবার এতটা ক্লেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—ওগো! তাই বটে গো তাই বটে! ওই যে সেই দয়ার সাগর প্রভু বটে গো প্রভু বটে! সে যতই দেখে, ততই যেন প্রভুর মাধুর্য্য উছলিয়া উছলিয়া পড়িতে লাগিল। সে সেই রূপ-মদিরা নয়ন-চসকে পান করে, আর ঢলিয়া-ঢলিয়া বলে,—হে প্রভু! আমি তোমার পরিমুণ্ডা যাই পরিমুণ্ডা যাই,—তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া লুটোপুটি খাই লুটোপুটি খাই! সে মাতালের মত সেই মধ্যপথেই ঢলিয়া পড়িয়া প্রভুকে বারংবার প্রণাম

করিল; চলিতে-চলিতে আবার উঠিয়া পড়িল এবং সেই চেঙ্গারি হইতে জোড়া-জোড়া আম্র লইয়া প্রভুকে দেখাইয়া বলে,—খাও খাও, আর মহাবাহু সেগুলি অন্যের অলক্ষ্যে লইয়া ভক্ষণ করেন। এইরূপে সে সেই দশ গণ্ডা আম্রই প্রভুকে খাওয়াইয়া ফেলিল। পণ্ডা ও অন্যান্য লোকজন সকলে তাহার ভাবখানা দেখিয়া প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে, লোকটা পাগোল, তারপর আম্রযুগ্মগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন,—এ লোকটা নিশ্চয়ই কোন মায়াবী হইবে। তাঁহারা তো আর প্রভুর শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া আম্রগুলি লইয়া আহার করার ব্যাপারখানা দেখেন নাই; তাই তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইবারই কথা! তা হউক, তাঁহাদের এ ধারণাও বড় মিথ্যা নয়। প্রকৃত পক্ষে ভক্তের মত মহা পাগোল মহা মায়াবী আর কে আছে? যাহার মায়ায় সেই মায়াধীশকেও মোহিত হইতে হয়!

সে যাহা হউক, শ্রীপ্রভু ভক্তপ্রদত্ত আম্রগুলি উপযোগ করিয়া নীলচক্র হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। ভক্তেরও ভাবের জমাটি ভাঙ্গিয়া গেল। সে যেন তখন অনেকটা সহজ মানুষ। তখন সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—ওহে দাস! তুমি কি উড়নবিদ্যা জান-টান,—না অপর কেহ ঐ বিদ্যার বলে তোমার আম্রগুলি উড়াইয়া লইয়া গেল? বলি, ব্যাপারখানা কি,—বল দেখি? উত্তরে বালিগ্রাম বলিল,—সে আম্র আমিও উড়াই নাই; অপর কেহও উড়াইয়া লয় নাই; উড়াইয়া লইয়াছেন স্বয়ং ভগবান্ জগন্নাথ

তিনিই সেগুলি আমার হস্ত হইতে লইয়া-লইয়া ভোজন করিয়াছেন। আপনাদের বিশ্বাস না হয় তো দেউলে গিয়া দেখিতে পারেন। তাহার কথা শুনিয়া তো সকলেই অবাক্! কেহ বলেন,—বেটা বাতুল, কেহ বলেন,—না হে না, চল একবার দেউলে গিয়া দেখিয়াই আসা যাক্ না কেন? কতিপয় সেবক ত্বরাত্বরি শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখেন,—অদ্ভুত ব্যাপার! শ্রীপ্রভুর রত্নবেদীর পার্শ্বে সেই দশ-গণ্ডা আম্রের খোসা ও আঁটি পড়িয়া আছে! তাঁহারা ভাবনিধির ভাবের বলিহারি দিতে-দিতে বালিগ্রামদাসের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং গৌরব-সহকারে তাহার গলায় প্রভুর প্রসাদী ধণ্ডামালা (বড় মালা) পরাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন,—ওহে দাস! তোমার জীবনই ধন্য, তুমি ভাবমূল্যে ভগবান্‌কে কিনিয়া লইয়াছ। মিছাই আমরা প্রভুর 'সেবক' বলাই, তুমিই প্রভুর প্রকৃত সেবক। আমরা কোন গুণেই তোমার ত্রিসীমা মাড়াইতে পারি না। অহো! তোমার মত ভক্ত দর্শনে আজ আমরা কৃতার্থ হইলাম, শাস্ত্রের কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, আর প্রভুর স্বভাবেরও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলাম। আজ আমরা উত্তমরূপেই বুঝিলাম,—

"যে যেড়ে নীচ জাতি হেউ। সে একা ভক্তিভাবে থাউ॥
তাহার পত্র ফল পুষ্প। পাইলে শ্রীহরি সন্তোষ॥
যে নর উচ্চ জাতি হেউ। শ্রীহরি-ভকতি ন থাউ॥
সে যেতে স্বাদু দ্রব্য দেলে। প্রভু ন ছুয়ন্তি তা ভলে॥"

যত নীচ জাতিই হউক না কেন, সে যদি ভক্তিভাবে বিভাবিত

হয়, তবে তাহার প্রদত্ত পত্র-পুষ্প ফল-টল যৎসামান্য যাহা-কিছু পাইলেই শ্রীহরি প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া উঠেন,—আনন্দে-আনন্দেই তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আর, হউক উচ্চ জাতি, সে ব্যক্তি যদি ভক্তিবিহীন হয়, তবে সে যতই না কেন স্বাদু উপাদেয় দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করুক, তিনি তাহা অঙ্গুলির অগ্রেও স্পর্শ করেন না। ওহে দাস! আমরা প্রভুর সেবক বিপ্র, আশীর্ব্বাদ করি,—তোমার এই বিশুদ্ধ ভাব বজায় থাকুক, দেহাবসানে তুমি পরম পদ লাভ কর।

বালিগ্রামদাস—"আমি ছার অস্পৃশ্য বাউরী, আমার প্রতি আপনাদের এতই কৃপা" প্রভৃতি আর্ত্তির কথা কহিতে-কহিতে তাঁহাদের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল এবং চরণের ধূলি লইয়া মস্তকের ভূষণ করিল। ব্রাহ্মণগণ আনন্দমনে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য লোকজনও প্রভুর বিচিত্র মহিমা এবং ভক্তের ভাবের প্রভাব ভাবিতে-ভাবিতে যথাকার্য্যে গমন করিলেন। বালিগ্রাম-দাসের তখন কি-জানি-কেন বড় কান্না পাইতে লাগিল; সে প্রভুর গুণ বিনাইয়া-বিনাইয়া এক চোট খুব কাঁদিয়া লইল; তাহার পর নীলচক্রের পানে চাহিয়া চক্রপাণির উদ্দেশে মানস-সম্ভাষণ করিতে লাগিল। বলিল,—প্রভু হে, আমার আর তো এখানে আসা হবে না ঠাকুর! আমি মহা পতিত মহা মন্দ খন্দাল-জাতি। কিন্তু তুমি যেরূপ ঢাক পিটিয়া আমাকে জাহির করিয়া দিলে, তাহাতে লোকে দেখিলে বলিবে কি?—ভক্ত—ভক্ত—ভারি ভক্ত। লোকের মুখ ত তখন বন্ধ করিতে পারিব না? তাহাদের

কথা শুনিতেই হইবে। শুনিতে-শুনিতে যদি অভিমান আসিয়া যায়,—তবেই ত আমার ইহলোক পরলোক অন্ধকারময় হইয়া গেল প্রভু! তার আর কাজ কি? আমি যেখানে-সেখানে থাকি না কেন, আশীর্ব্বাদ কর—যেন সেখানে-সেখানেই তোমায় দর্শন পাই। আর আজ বিদায়ের পূর্ব্বে আর একটি বাসনা জানাইব, এ বাসনা বহুদিনের বাসনা,—তোমার দশ অবতারের দশবিধ মূর্ত্তি একবার আমায় দেখাইতে হইবে। কৃপা করিয়া তাহা একবার দেখাইয়া দাও, আর আমি তোমার মহিমার গান গাহিতে-গাহিতে বিদায় লই।

ভক্তের বাসনা ভগবানের না রাখিলে চলে না। তিনি কি করেন, সেই নীলচক্র হইতেই তাহাকে মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার-মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং ভাবে-ভাবে দেখা দিবেন—ইঙ্গিতে অঙ্গীকার করিয়া হাস্যমুখে বিদায় দিলেন। বালিগ্রামদাসও প্রণতি-মিনতি করিয়া প্রভুকে অন্তরের কথা জানাইয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যতদূর দৃষ্টি চলে—ফিরিয়া-ফিরিয়া নীলচক্রের দিকে চাহিয়া দেখে,—তখনও জগন্নাথ সেখানে মাধুর্য্যের ভাণ্ডার উথাড়িয়া দাঁড়ায়ে আছেন। দেখিতে-দেখিতে নীলচক্র অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিগ্রামদাস এইবার বাহিরের শ্রীমন্দির ছাড়িয়া মনোমন্দিরে চিন্তামণিকে চিন্তা করিতে-করিতে আপন গ্রামে আগমন করিল।

যে প্রতিষ্ঠার ভয়ে সে শ্রীক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিল, সেই প্রতিষ্ঠা কিন্তু তাহাকে ছাড়ে না। সে বালিগ্রামে আসিবায়

বহুপূর্ব্বেই তাহার ভক্তিকীর্ত্তি সেখানে আসিয়া পঁহুছিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলে সকলেই ধন্যধন্য করে,—তাহার ভাগ্যের শতমুখে প্রশংসা করে। এ সব শুনিতে তাহার ভাল লাগেনা,—বরং ঘৃণা হয়—ভয় হয়। তাই তাহাকে বাটীর বাহির হওয়া ছাড়িতে হইল। সতী রমণীর অন্তঃপুরই ব্যবস্থা। সে প্রাণে-প্রাণে প্রাণপতির উপাসনা করিবে বলিয়াই বোধ হয় ভগবান্ তাহার এই অবরোধের বিধান করিলেন। সে আর কাপড় বোনে না, কিছুই করে না; কেবল হরি বলিয়া হাসে কাঁদে নাচে গায়, আর আমোদভরে এলাইয়া যায়। তাহার আহারের ভার বিশ্বপতিই আপন হস্তে লইলেন। বিশ্বপতির প্রেরণায়—পাঁচজনের করুণায় পতি-পত্নীর কিছুরই অভাব নাই। আনন্দে-আনন্দেই তাহাদের গোণা দিন কাটিয়া গেল। দেহাবসানে দিব্যদেহে তাহারা দেবদেবের পাদপদ্ম লাভ করিল।

ফুল ফুটিয়া—সুবাস ছড়াইয়া—মধু লুটাইয়া ঝরিয়া পড়ে; আর তাহার সুবাসের লেশ মিলে না। এ রাজ্যের ফুলের এইরূপ দশাই বটে। কিন্তু ভগবানের খাস-বাগানের এই পবিত্র পুষ্পটি বিমল যশের সুবাস ছড়াইয়া,—মধুমথনের নামের মধু প্রেমের মধু লুটাইয়া দিয়া, অন্তর্হিত হইলেও তাহার স্বর্গীয় সুষমা আজিও অন্তরেঅন্তরে বিরাজিত,—তাহার স্বর্গীয় সৌরভে আজিও চারিদিক আমোদিত।

মঙ্গল-আদি বিচারি ইহ, বস্তু ন ঔর অনূপ।
হরিজনকে যশ গাবতে,—হরিজন মঙ্গলরূপ ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো, মথি পুরাণ ইতিহাস।
ভজবেকো দোঈ সুঘর —কৈ হরি কৈ হরিদাস ॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দঈ,—ভক্তনকো যশ গাব।
ভবসাগরকে তরণকো, নাহিঁন আন উপাব ॥

বিচার করিয়া চিতে, মঙ্গলাদি বিধিমতে,
অনুপম বস্তু স্থির হৈল।
হৈতে ভক্ত গুণ-গান, মঙ্গল নাহিক আন,
হরিজন সাক্ষাত মঙ্গল ॥
যত সাধুসন্ত-জন, মিলি কৈল নিরূপণ,
মথিয়া পুরাণ ইতিহাস।
ভজিবার ভাল ঠাঁই, দুই বই তিন নাই,
হয় হরি নয় হরিদাস ॥
অগ্রদেব অনুমতি, কৈল নাভাজীর প্রতি,
ভক্ত-যশ গাহিবার তরে।
ইহা বই নাই নাই, অপর উপায় ভাই,
তরিবারে ভব-পারাবারে ॥

(৫) শ্রীলঘুভাগবতামৃত,—শ্রীপাদরূপ গোস্বামি-রচিত মূল, বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা, মদনগোপাল প্রভুর বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাদি যুক্ত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব এবং বিবিধ অবতারের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার এমন গ্রন্থ আর নাই। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ২। নয়সিকা।

(৬) ভক্তের জয়,—ভক্ত চরিত্রের অমৃত-প্রস্রবণ। ইহার শীতল ধারায় অভিষিক্ত হইলে ত্রিতাপ-জ্বালার শান্তি হইবে,—নিত্য নূতন আনন্দে মন-প্রাণ আন্দোলিত হইতে থাকিবে,—হরি-ভক্তির বিমল জ্যোতিতে অন্তর বাহির উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে ৮ আটটি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১১ এগারটি চরিত্র বিন্যস্ত হইয়াছে। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৲ একটাকা।

ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান,—

শ্রীহরিবোল অধিকারী।

৪০ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,

সিমলা পোঃ আঃ ; কলিকাতা।

অথবা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।